রামায়ণী-গল্প।

প্রকাশক

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ হালদার।

৬৩নং কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

তৃতীয় সংস্করণ।

প্রিণ্টার :—শ্রীকুলচন্দ্র দে,

"শাস্ত্রপ্রচার প্রেস"

৫নং ছিদামমুদির লেন, কলিকাতা

১৯১৫।

মূল্য ৷৵৹ দশ আনা।

প্রাইজ দিবার বই।

টুক্‌টুকে বই	।০
ঝিক্‌মিকে বই	॥০
হাসিমুখ	।১০
লিপিমালা	।০
ইজি লেটার এণ্ড এসে রাইটার	॥৵০
বয়েজ গাইড্ প্রথম	।/০
বয়েজ গাইড্ দ্বিতীয়	৶০
রাজা রামমোহন	॥০
কবিতা কানন	৵০
শ্রীবৎসোপাখ্যান	১৲
সাবিত্রী	১৲
শিশুশিক্ষা ৩য় ভাগ	৵০
সচিত্র সপ্তকাণ্ড রামায়ণ	১॥০
পৌরাণিক কথা	।৵০
সীতার বনবাস (বিদ্যাসাগর)	৸০
শকুন্তলা (ঐ)	॥৵০
দুষ্মন্ত শকুন্তলা	৸০
আরাধনা	১৲

নূতন পুস্তক।

লিপিমালা ঃ—শ্রীজ্ঞানেন্দ্র নাথ হালদার কর্ত্তৃক প্রকাশিত মূল্য ।০, মাশুল ৴১০। যদি তুমি বিশুদ্ধভাবে বাঙ্গলায় চিঠি পত্র লিখিতে ইচ্ছা কর, তবে আমাদের "লিপিমালা" ভাল করিয়া পড়িয়া রাখ। কিংবা যদি তুমি গ্রামে অত্যাচারবশতঃ মাননীয় ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট, দারোগা ইত্যাদি মহোদয়গণের নিকট অত্যাচার নিবারণের জন্য দরখাস্ত করিতে চাও, তাহা হইলে তোমার একখানি "লিপিমালা" ঘরে রাখা নিতান্ত আবশ্যক। আর যদি গ্রামবাসিগণের পাট্টা, কবুলতি খতপত্র ইত্যাদি লিখিয়া দিয়া কিছু কিছু উপার্জ্জন করিতে চাও তাহা হইলে "লিপিমালা" খানি সর্ব্বদা সঙ্গে রাখ। প্রত্যেক ছাত্রেরই পত্র দলিল লিখন বিষয়ে পরীক্ষা দিবার পূর্ব্বে "লিপিমালা"খানি পড়িয়া রাখা নিতান্ত আবশ্যক।

ইজি লেটার ও এসে রাইটার ঃ—শ্রীজ্ঞানেন্দ্র নাথ হালদার কর্ত্তৃক প্রকাশিত মূল্য ॥৵০, মাশুল ৴০। যদি বিশুদ্ধ ইংরাজীতে ও সরল ভাষায় সকলের নিকট পত্রাদি লিখিতে চাও, তাহা হইলে "ইজিলেটার ও এসে রাইটার" খানি সর্ব্বদাই পকেটে রাখিতে হইবে। যিনি অতি অল্পমাত্রও ইংরাজি জানেন তিনিও এই পুস্তকের সাহায্যে অতি অল্প সময়ে বিশুদ্ধ ইংরাজীতে চিঠি পত্র লিখিতে পারিবেন।

স্কুল বয়েজ্ গাইড ঃ—শ্রীজ্ঞানেন্দ্র নাথ হালদার কর্ত্তৃক প্রকাশিত প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ একত্রে ॥০। হাটে ঘাটে, বাজারে, পথে, সহরে, বিশেষতঃ রেলষ্টেসনে ইংরাজীতে কথা বলিতে হইলে আমাদের প্রকাশিত "স্কুল বয়েজ্ গাইড" সর্ব্বদাই সঙ্গে রাখা আবশ্যক। এই পুস্তকের সাহায্যে অতি অল্প সময়ে এবং তাড়াতাড়ি অথচ বিশুদ্ধভাবে ইংরাজিতে কথা বলিতে পারা যাইবে। ইংরাজি শিক্ষার পক্ষে ইহা উৎকৃষ্ট পুস্তক।

রামায়ণী গল্প ঃ—শ্রীজ্ঞানেন্দ্র নাথ হালদার কর্ত্তৃক প্রকাশিত। গল্পচ্ছলে সমস্ত রামায়ণখানি লিখিত হইয়াছে, এবং ইহাতে বহুতর চিত্রও সন্নিবেশিত করা হইয়াছে। ভাষা সরল, বাঁধান উৎকৃষ্ট, মূল্য ॥৵০ আনা।

ইংলিস-সেল্ফ্-টিচার ঃ—দুই জন গ্রাজুয়েট কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য ৸০, নিজে নিজে ইংরাজী শিক্ষার জন্য নূতন ধরণে এই পুস্তক প্রস্তুত হইয়াছে। যাঁহারা কিছুই ইংরাজী জানেন না, তাঁহারাও শিক্ষকের বিনা সাহায্যে অতি অল্প সময়ের মধ্যে ইংরাজিতে কথাবার্ত্তা বলিতে ও চিঠি পত্র লিখিতে পারিবেন। এমন কি স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে যাঁহারা বাঙ্গালা লিখিতে ও পড়িতে পারেন, তাঁহারাও এই পুস্তকের সাহায্যে ঘরে বসিয়া অতি অল্প সময়ের মধ্যে ইংরাজিতে চিঠি পত্র লিখিতে পারিবেন।

নূতন পুস্তক।

ঝিক্‌মিকে বই :—মূল্য আট আনা। সরল অথচ শিশুদিগের কৌতুকপ্রদ গল্পে পুস্তকখানি লিখিত এবং ঐ সকল গল্পের অনুযায়ী বৃহৎ বৃহৎ চিত্র আছে। বাঁধান অতীব সুন্দর, কাগজ ও ছাপা এত ভাল বোধ হয় যেন ইহার পূর্ব্বে এই প্রকার পুস্তক এদেশে প্রকাশিত হয় নাই। স্কুল প্রাইজের মধ্যে ইহা একখানি উৎকৃষ্ট পুস্তক বলিতে হইবে।

হাসিমুখ :—শ্রীজ্ঞানেন্দ্র নাথ হালদার কর্ত্তৃক প্রকাশিত, ।০ চারি আনা। মজার মজার গল্পে ইহা লিখিত হইয়াছে। সুন্দর সুন্দর ছবি সন্নিবেশিত করিয়া মুদ্রিত হইয়াছে, ছেলেরা ইহা পাইলে আনন্দে নৃত্য করিতে থাকিবে এবং পাঠের প্রতি আপনা হইতেই তাহাদের মনাকৃষ্ট হইবে।

শ্রীবৎসোপাখ্যান :—শ্রীজ্ঞানেন্দ্র নাথ হালদার কর্ত্তৃক প্রকাশিত, মূল্য ১৲, মাশুল ৵০। এই পুস্তক পাঠে মন স্বতঃই ধর্ম্মের প্রতি আকৃষ্ট এবং পাপের প্রতি বিতৃষ্ণা জন্মিয়া স্বর্গীয়ভাবে পরিপূরিত হইয়া এক অপূর্ব্ব আনন্দ অনুভব করিতে থাকে। চরিত্র গঠনের নিমিত্ত এই উপন্যাস পাঠ করা নিতান্ত আবশ্যক। ভাষা সরল, বাঁধান সুন্দর, ছাপা পরিষ্কার। পড়িতে আরম্ভ করিলে, শেষ না করিয়া থাকিতে পারা যায় না। বঙ্গললনাগণের ইহা প্রতিদিন পাঠ করা উচিত। ইহার দ্বিতীয় সংস্করণে এত চিত্র প্রদত্ত হইয়াছে যে, কেবল ছবি দেখিলেই, অর্থ-ব্যয় সার্থক মনে হইবে।

সাবিত্রী :—শ্রীজ্ঞানেন্দ্র নাথ হালদার কর্ত্তৃক প্রকাশিত, মূল্য ১৲, মাশুল ৵০। 'সাবিত্রী' বঙ্গললনা গণের একমাত্র সহচরী। 'সাবিত্রী' সতীসাধ্বী পতিব্রতাগণের ধর্ম্মপথ প্রদর্শিনী। "সাবিত্রী" রমণীগণের চরিত্র-গঠনের একমাত্র উপকরণ। সাবিত্রী ব্রতোপবাসের পরে এই 'সাবিত্রী আখ্যায়িকা পাঠ করা প্রত্যেক হিন্দুরমণীরই একান্ত কর্ত্তব্য। ইহার ভাষায় পাণ্ডিত্য আছে, সত্যবানের ধর্ম্মনিষ্ঠা, সাধুতা ও সত্যবাদীতার বিষয় যখন পড়িতে আরম্ভ করা যায়, তখন অতি পাষণ্ডের মনও সৎ পথে অগ্রসর হয়। ছাত্রগণের ইহা পাঠ করা আবশ্যক।

মেঘনাদবধ কাব্য :— মাইকেল প্রণীত মূল্য ৸০ বার আনা। মাশুল ৴১০। (Halder's Pocket Edition) (সচিত্র) মেঘনাদবধ কাব্যের নূতন করিয়া পরিচয় দিতে হইবে না। মধুসূদনের অমৃতময়ী লেখনী হইতে যে অমৃত প্রস্রবণ নিসৃত হইয়া সমস্ত বঙ্গদেশকে মাতাইতেছে, তাহা সকলেই অবগত আছেন, অধিকন্তু ইহাতে G. N. Halder কর্ত্তৃক গ্রন্থকারের সংক্ষিপ্ত-জীবনী এবং Introduction ও ইহার কঠিন শব্দার্থ সকল প্রদত্ত হইয়াছে। ইহাই যে মেঘনাদ বধের সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর সংস্করণ তাহা বলাই বাহুল্য। বাঁধান অতীব উৎকৃষ্ট।

রামায়ণী গল্প।

বালকাণ্ড।
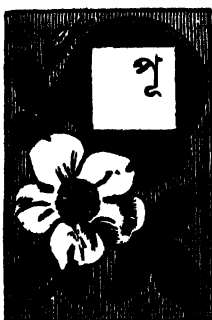
পূর্ব্বে বাল্মীকি নামে একজন মুনি ছিলেন, তিনি রাম জন্মিবার ষাট হাজার বৎসর পূর্ব্বে রামায়ণ লিখিয়াছেন। বাল্মীকি একদিন প্রাতঃকালে স্নান করিতে যাইতেছিলেন, এমন সময় একজন ব্যাধ একটি চক্রবাক্ ও চক্রবাকীকে মারিতে দেখিয়া হঠাৎ তাঁহার মুখ হইতে একটি নূতন রকমের সংস্কৃত শ্লোক বাহির হয়, ব্রহ্মা এই নূতন শ্লোক শুনিয়া বাল্মীকির সম্মুখে উপস্থিত হন, এবং তাঁহাকে রামায়ণ লিখিতে বলেন, এই জন্যই রামায়ণ সেই নূতন সংস্কৃত ছন্দে লেখা হইয়াছে। বাল্মীকিই প্রথম সংস্কৃত কবি। তাঁহার পূর্ব্বে অন্য কেহই এরূপ পুস্তক লেখেন নাই।

বাল্মীকি ও ব্রহ্মা।

পূর্ব্বকালে সরযূ নদীর তীরে অযোধ্যা নামে এক রাজধানী ছিল। রাজধানীতে বড় বড় দালান, দালানের চারিদিকে ফুলের বাগান ও তাহার মধ্যে মণিমুক্তা প্রভৃতির কাজ করা ছিল। এই রাজধানী দেখিলে স্বর্গের ন্যায় বোধ হইত। দিবারাত্রি মণি-মুক্তার কিরণে, বাড়ী ঘরগুলি চক্ চক্ করিত। সেই অযো-ধ্যায় দশরথ নামে এক রাজা রাজত্ব করিতেন। দেবতাগণ তাঁহার বন্ধু ছিলেন। দেবতাদিগের সহিত অসুরদিগের যুদ্ধ বাধিলে রাজা দশরথ যুদ্ধে যাইয়া অসুরসকলকে মারিয়া ফেলিতেন এবং দেবতাদিগকে নির্ভয় করিতেন। রাজা দশরথ প্রজাদিগকে আপন পুত্রের ন্যায় প্রতিপালন করিতেন, সর্ব্বদা ন্যায় বিচার দ্বারা তাঁহাদিগকে সন্তুষ্ট করিতেন; তাঁহার সভায় ব্রাহ্মণ ও মুনিগণের বড়ই মান্য ছিল, রাজা কর্ম্মচারী ও অন্যান্য সকলকেই উচিতমত সম্মান দেখাইতেন।

একদিন রাজা দশরথ মৃগয়া করিবার মানসে অনেক হাতী ঘোড়া লোক জন লইয়া মৃগয়া করিতে বাহির হইলেন; এবং এক গহন বনে প্রবেশ করিয়া মৃগের অন্বেষণে বনমধ্যে বিচরণ করিতে লাগিলেন। ক্রমে তিনি শ্রান্ত হইয়া এক সরোবর-তীরে উপস্থিত হইয়া তথায় এক বৃক্ষ তলে উপবেশন করিলেন। এমন সময়ে অন্ধক মুনির পুত্র সিন্ধু, জল লইবার জন্য সেই সরোবরে আসিয়া কলসীতে জলপূর্ণ করিতেছিলেন, শূন্য কল-সীতে জল পূর্ণ করিবার সময় উহাতে এক প্রকার "বুক্ বুক্" শব্দ হইতে লাগিল। ঐ বুক্ বুক্ শব্দ শুনিয়া রাজা দশরথ হরি-

পের শব্দ মনে করিয়া শব্দভেদী বাণ নিক্ষেপ করিলেন। শব্দভেদী বাণ অতি ভয়ানক; শব্দ শুনিয়াই গমন করে এবং যাহার প্রতি লক্ষ্য করা হয় তাহার প্রাণ বিনাশ করে।

সিন্ধু বধ।

হায়! হায়! কি সর্ব্বনাশ হইল, বাণ আসিয়া অন্ধক-মুনির পুত্রের প্রাণ বিনাশ করিল, তখন দশরথ দৌড়িয়া আসিয়া

দেখেন সিন্ধু বাণের আঘাতে প্রাণ হারাইয়াছে। তখন রাজা দশরথ সিন্ধুর মৃতদেহ স্কন্ধে করিয়া, তাঁহার মাতাপিতার নিকট লইয়া গেলেন।

অতি নিকটে অন্ধক মুনির আশ্রম ছিল, সিন্ধুর মৃতদেহ লইয়া তাঁহার অন্ধ মাতাপিতার নিকট উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহাদিগকে যথোচিত বন্দনা করিয়া সিন্ধুর মৃত্যুর কারণ সমস্ত বলিলেন।

তাহাদিগের একমাত্র পুত্র সিন্ধুর নিধন-সংবাদে তাঁহারা নিতান্ত কাতর হইলেন এবং রাজাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, রাজন্! এই পুত্রের প্রাণবিয়োগ-সংবাদে এখনি আমাদিগের মৃত্যু হইবে, তোমা হইতে আমাদিগের এই দশা হইল, পুত্রশোকে আমাদিগকে যেমন প্রাণত্যাগ করিতে হইল, সেই প্রকার একদিন তোমাকেও পুত্রশোকে এই ধরাধাম ত্যাগ করিতে হইবে।

রাজা মনে করিলেন আমার ত ছেলে নাই, ছেলে হবে তার পরে তারা মর্‌বে, তার পর তাহাদের শোকে আমার মৃত্যু, সে অনেক দূরের কথা! এত আশীর্ব্বাদ। রাজা প্রফুল্ল-চিত্তে, তাঁহাদিগকে প্রণাম করিয়া বিদায় হইলেন এবং অযোধ্যায় আসিয়া পুনরায় রাজকার্য্য করিতে লাগিলেন।

রাজা দশরথের অনেকগুলি স্ত্রী ছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে কৌশল্যা, কৈকেয়ী ও সুমিত্রা এই তিন জন প্রধানা ছিলেন। প্রথমে রাজা দশরথের পুত্র হয় নাই, কেবল শান্তা নাম্নী একটী

কন্যা হইয়াছিল, শান্তাকে রাজা দশরথ তাঁহার বন্ধু লোমপাদ রাজাকে দান করিয়াছিলেন। কৌশল্যা,কৈকেয়ী ও সুমিত্রা, এই তিন জন রাণীর মধ্যে কাহারও সন্তান হইল না দেখিয়া, রাজা দশরথ বড়ই মনে কষ্ট পাইতে লাগিলেন এবং দেবতার নিকট 'পুত্র হউক' বলিয়া নানারূপ পূজা ও মানসিক করিতে লাগিলেন। অবশেষে রাজা, তাঁহার প্রধান মন্ত্রী ও পুরোহিত প্রভৃতি সকলের পরামর্শ লইয়া, পুত্র জন্মাইবার জন্য একটী যজ্ঞ করা স্থির করিলেন এবং সেই যজ্ঞে আহুতি দিবার জন্য বিভাণ্ডক মুনির পুত্র ঋষ্যশৃঙ্গকে অযোধ্যায় আনিতে অযোধ্যা নগর হইতে কয়েকটি নর্ত্তকীকে ঋষ্যশৃঙ্গের নিকট পাঠাইলেন। তাহারা সময় বুঝিয়া বিভাণ্ডক মুনির আশ্রমে উপস্থিত হইল, এবং মুনি আশ্রমে নাই দেখিয়া তাঁহার পুত্র ঋষ্যশৃঙ্গের নিকট বনদেবী বলিয়া পরিচয় দিল এবং তাঁহাকে নানারূপ ছলে ভুলাইয়া অযোধ্যায় লইয়া আসিল। রাজা দশরথ ঋষ্যশৃঙ্গকে দেখিয়া বড়ই আনন্দিত হইলেন এবং পুত্রেষ্টি যজ্ঞ করিবার দ্রব্যাদি আনয়ন করিতে ভৃত্যগণকে আদেশ দিলেন।

রাজার আজ্ঞায় চারিদিক্ হইতে যজ্ঞের আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি আসিতে আরম্ভ হইল। যজ্ঞে মন্ত্র পড়িয়া অগ্নিতে ঘৃতের আহুতি দিতে হয় ও দেবতাদিগকে পূজা করিতে হয়। ঘৃত, যজ্ঞের কাঠ, আহুতি দিবার জন্য যজ্ঞ ডম্বুরের সমিধ্, কুশ ও নানা জাতীয় ফলপুষ্প প্রভৃতিতে যজ্ঞের স্থান পূরিয়া উঠিল। ঋষ্যশৃঙ্গ মুনি অন্যান্য পুরোহিতদিগের সহিত মন্ত্রণা করিয়া যজ্ঞ আরম্ভ করিবার

দিন ও সময় ঠিক করিলেন এবং যজ্ঞের স্থানে উচু করিয়া একটী বেদী প্রস্তুত করাইলেন। বেদীর সম্মুখে আগুন জ্বালিবার জন্য শাস্ত্রের বিধান অনুসারে সুন্দরলক্ষণযুক্ত একটী কুণ্ড কাটাইলেন। কুণ্ডের উপর জলপূর্ণ ঘট ও তাহার মুখে আম্রপল্লব ও নারিকেল ফল দিয়া সাজাইলেন। যজ্ঞের গৃহে আসিবার দরজার দুই-দিকে দুইটী কলাগাছ ও জলপূর্ণ ঘট রাখিয়া দিলেন এবং রাস্তার মধ্যে মধ্যে কয়েকটী সুন্দর তোরণদ্বার প্রস্তুত করাইলেন।

তাহার পর নির্দ্দিষ্ট দিনে মুনি ঋষ্যশৃঙ্গ ও আর আর মুনিরা এবং পুরোহিতগণ যজ্ঞস্থানে আসিলেন। রাজা ও রাণীরা সকলে পবিত্র ভাবে শুদ্ধবেশে তথায় উপস্থিত হইলে, মুনিগণ রাজার পুত্রলাভ কামনা করিয়া যজ্ঞ আরম্ভ করিলেন। মুনি ঋষ্যশৃঙ্গ

ঋষ্যশৃঙ্গের যজ্ঞ।

ও আর আর পুরোহিতগণ যজ্ঞে ব্রতী হইয়া বেদীর চারিদিকে পূজার ও যজ্ঞের পৃথক্ পৃথক্ দ্রব্যাদি লইয়া বসিলেন ও নানারূপ

সুরের সহিত বেদমন্ত্র উচ্চারণ করিয়া, যজ্ঞকুণ্ডে কাঠ দিয়া তাহাতে অগ্নি জ্বালিলেন। ঘৃত ও সমিধ্ দ্বারা হোম আরম্ভ হইলে, সেই অগ্নিতে নানারূপ সুগন্ধি দ্রব্য দ্বারা হোম করিতে লাগিলেন। অগ্নিকুণ্ড হইতে ঘৃত, চন্দন, কাষ্ঠ ও অন্যান্য দ্রব্য পুড়িয়া এক অপূর্ব্ব সুগন্ধ উঠিয়া চারিদিক্ আমোদিত করিয়া তুলিল। ঋষিদিগের মুখ হইতে পবিত্র বেদমন্ত্র সকল অতি শুদ্ধ-ভাবে উচ্চারিত হইতে লাগিল, প্রত্যেক মন্ত্রের উচ্চারণে তাহার পদ ও প্রতি অক্ষরগুলি যেন জীবন্ত বলিয়া সকলে বোধ করিতে লাগিলেন। যজ্ঞের অগ্নি ঘৃতের আহুতি পাইয়া ক্রমেই বাড়িয়া উঠিতে আরম্ভ হইল এবং ঋষিগণ ক্রমে উচ্চৈঃস্বরে মন্ত্র পড়িতে লাগিলেন। এই সময় যজ্ঞস্থানের এক অপূর্ব্ব শোভা হইয়া উঠিল। চারিদিক্ হইতে নিমন্ত্রিতগণ পুঁতুলের ন্যায় অচল ভাবে দাঁড়াইয়া যজ্ঞ দেখিতে লাগিলেন। যজ্ঞের চরু পাক করিতে হয়। মুনিগণ মন্ত্র পড়িয়া সেই যজ্ঞের অগ্নির উপর চরুস্থালীতে দুগ্ধ, ঘৃত ও চাউল দিলেন। ক্রমে তাহাতে এক অপূর্ব্ব পায়স প্রস্তুত হইল, তাহাই যজ্ঞের চরু। তদ্দারা দেবতা-দিগের হোম করিলে পরে হোমাগ্নি হইতে, নারায়ণ আবির্ভূত হইয়া দশরথকে বর দিলেন এবং অবশিষ্ট চরু রাণীদিগকে খাইতে বলিয়া পুনরায় অগ্নিতে প্রবেশ করিলেন। নারায়ণের আদেশক্রমে তাঁহারা অবশিষ্ট চরু সমভাগে বিভক্ত করিয়া এক ভাগ কৌশল্যা ও এক ভাগ কৈকেয়ীর নিকট পাঠাইলেন; কৌশল্যা ও কৈকেয়ী তাহা হইতে তাঁহাদের প্রত্যেকের ভাগের

নারায়ণের আবির্ভাব।

অর্দ্ধেক অংশ সুমিত্রাকে দিলেন। এইরূপে কৌশল্যা, কৈকেয়ী ও সুমিত্রা তিন জনেই যজ্ঞচরু ভক্ষণ করিলেন। যজ্ঞের শেষে মুনি ঋষ্যশৃঙ্গ পূর্ণাহুতি দিয়া যজ্ঞ সমাধা করিলেন। এই প্রকারে চরু ভক্ষণ করাতে কৌশল্যার রাম, কৈকেয়ীর ভরত ও সুমিত্রার লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্ন নামে পুত্র জন্মে।

রাজা দশরথের ছেলে ছিল না, এখন চারিটী ছেলে হইল। তিনি বড়ই সুখী হইলেন এবং অতি যত্নের সহিত তাহাদিগকে প্রতিপালন করিতে লাগিলেন, তাহাদিগকে লেখাপড়া ও যুদ্ধ শিখাইবার নিমিত্ত উপযুক্ত শিক্ষক রাখিলেন। ছেলেদের নাম রাম, লক্ষ্মণ, ভরত ও শত্রুঘ্ন। ইহারা যেমন দেখিতে সুন্দর, তেমনই বুদ্ধিমান্ ও তেমনই ধীর শান্ত। অতি অল্প দিনের মধ্যেই তাহারা সকল বিদ্যা শিখিয়া ফেলিল। ছেলে বেলায় তাহারা চারি ভাই একত্রে খেলা করিত, এক সঙ্গে খাইত ও এক ঘরে ঘুমাইত, পরে লেখাপড়া শিখিবার সময়ও এক সঙ্গেই সকল কাজ করিত। এইরূপে একত্রে থাকিয়া তাহাদের

রাম, লক্ষ্মণ, ভরত ও শত্রুঘ্ন।

মধ্যে ভালবাসা ক্রমেই বাড়িয়াছিল, কেহ কাহাকেও না দেখিয়া থাকিতে পারিত না, তাহাদের মধ্যে লক্ষ্মণের রামের উপর ও শত্রুঘ্নের ভরতের উপর আরও বেশী টান ছিল; একজন আর

একজনকে ক্ষণকালের জন্যও তফাৎ হইতে দিত না। তাহাদের এই প্রকার ভালবাসা দেখিয়া লোকে বলিয়া থাকে যেন "রামের ভাই লক্ষ্মণ"। লক্ষ্মণ রামকে কত ভালবাসিত তাহা তোমরা ক্রমে বুঝিতে পারিবে।

মুনিঋষিরা বনে বাস করেন ও তথায় তপস্যা করেন। তাঁহারা বনের ফল মূল ও ঝরণার জল খাইয়া বাঁচেন। মধ্যে মধ্যে অনেক মুনি একত্র হইয়া নানা প্রকার যাগ যজ্ঞ করিতেন। ইহাতে দেবতারা সন্তুস্ট হইয়া পৃথিবীর মঙ্গল করিতেন। মুনি-দিগের কোন বিপদ্ হইলে, রাজা তাঁহাদিগকে বিপদ্ হইতে রক্ষা করিতেন। এইরূপে মুনিদিগকে রক্ষা করায় রাজার পুণ্য হয় ও মুনিদিগের তপস্যার ভাগ পান।

মুনিরা যজ্ঞের আয়োজন করিয়া যখন সমস্ত জিনিষ পত্র লইয়া যজ্ঞ আরম্ভ করিতেন, সেই সময় যজ্ঞের ধূম দেখিয়াই রাক্ষসেরা দলে দলে আসিয়া যজ্ঞের জিনিষ পত্র খাইয়া ফেলিত ও যজ্ঞ নষ্ট করিয়া দিত। ঐ সকল রাক্ষসের দলে, মারীচ ও সুবাহু নামে দুইটা বড় বলবান রাক্ষস ছিল। কেহই তাহাদের সহিত যুদ্ধে পারিত না। তাহাদের জ্বালায় মুনিরা যজ্ঞ করিতে পারিতেন না।

একদিন মুনিরা সকলে একত্র হইয়া পরামর্শ করিলেন যে, অযোধ্যায় রাজা দশরথের নিকট যাইয়া,তাঁহার দুই ছেলে রাম ও লক্ষ্মণকে আনিয়া রাক্ষস দুইটাকে মারিয়া ফেলিলে আর তাঁহাদের যজ্ঞ নষ্ট হইবে না। ইহা স্থির করিয়া মুনি বিশ্বামিত্র

মুনিগণের পরামর্শ।

রাম ও লক্ষ্মণকে আনিবার জন্য, অযোধ্যায় দশরথের সভায় গেলেন। রাজা দশরথ বিশ্বামিত্রকে আসিতে দেখিয়া, সিংহাসন ছাড়িয়া, তাঁহাকে প্রণাম ও পূজা করিলেন, ও তাঁহাদের আশ্রমের ও তপস্যার খবর জিজ্ঞাসা করিলেন। মুনি বলিলেন, আমরা নির্ব্বিঘ্নে যজ্ঞ করিতে পারিতেছি না। মারীচ ও সুবাহু নামে দুইটা রাক্ষস আসিয়া যজ্ঞ নষ্ট করিয়া দেয়। মারীচ ও সুবাহু রাক্ষসের রাজা রাবণের চর; রাম ও লক্ষ্মণকে আমার সঙ্গে পাঠাও,তাহারা দুই ভাই রাক্ষস দুইটিকে মারিয়া ফেলিবে, তাহা হইলে আমরা নিরাপদে যজ্ঞ করিতে পারিব।

রাজা দশরথ রামকে বড় ভাল বাসিতেন, রামকে ছাড়িয়া থাকিতে পারিতেন না। মুনির এই কথা শুনিয়া তাঁহার বড়ই ভাবনা হইল। রামকে রাক্ষসের মুখে পাঠাইয়া, তিনি থাকিতে পারেন না, এবং না পাঠাইলেও মুনি রাগ করিবেন। হয়ত মুনির শাপে তিনি সবংশে পুড়িয়া মরিবেন।

ব্রাহ্মণের রাগে বড় বিপদ। সকলের নিকট রক্ষা আছে,

কিন্তু ব্রাহ্মণ অসন্তুষ্ট হইলে আর নিস্তার নাই। এই ভাবিয়া রাজা দশরথ নিতান্ত কাতর মনে মুনির সহিত রাম ও লক্ষ্মণকে পাঠাইয়া দিলেন। বিশ্বামিত্র রাজাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া, রাম ও লক্ষ্মণকে সঙ্গে লইয়া, আশ্রমের দিকে চলিলেন।

একটা বড় বনের ভিতর দিয়া আশ্রমে যাইতে হয়, সে বনে বড় ভয়। তাড়কা নাম্নী একটা প্রকাণ্ড রাক্ষসী সেই বনে বাস করিত। তাহার ভয়ে কাহারও সাধ্য নাই যে, সে পথে যায়। কেহ সে বনে প্রবেশ করিবা মাত্র, তাড়কা তাহাকে খাইয়া ফেলিত। মুনি ঋষিরাও তাহাকে ভয় করিয়া চলিতেন। তাড়কার স্বামীর নাম সুন্দ। সুন্দও ভয়ানক রাক্ষস ছিল। মারীচ ও সুবাহু তাড়কার ছেলে। তাড়কা যে বনে বাস করে সেই পথটী অনেক সোজা, কিন্তু যে কেহ সে পথে যায়, তাড়কা তাহাকে

বনপথে রাম, লক্ষ্মণ ও বিশ্বামিত্র।

ধরিয়া খাইয়া ফেলে। এজন্য কেহ সেপথে যাইত না। বিশ্বামিত্র

রামের দ্বারা তাড়কাকে মারিবার জন্য রামকে কয়েকটি নূতন অস্ত্র শিক্ষা দিলেন এবং সেই ভয়ানক পথে লইয়া চলিলেন। তাড়কা মানুষের গন্ধ পাইয়া, গাছ পাথর ভাঙ্গিয়া মহাশব্দে সেই দিকে আসিতে লাগিল। অমনি রাম ধনুকে বাণ দিয়া যুদ্ধ করিবার জন্য দাঁড়াইলেন। রামকে দেখিয়া তাড়কার বড়ই আহ্লাদ হইল। রাম বালক ও কোমল শরীর, তাহার মাংস তাড়কার পক্ষে বড়ই সুখাদ্য হইবে। কিন্তু রাম বালক হইলে কি হয়, তাঁহার বাণের চোটে তাড়কা অস্থির হইয়া উঠিল। রামের বাণে তাড়কার প্রকাণ্ড শরীর, ছিঁড়িয়া রক্তময় হইয়া উঠিল। শেষে তাড়কা মাটিতে পড়িয়া মরিয়া গেল। তাড়কা

তাড়কা রাক্ষসী বধ।

রাক্ষসী চিরকাল মানুষ খাইয়া বাঁচিয়াছে, কত পাপ করিয়াছে

তাহার অবধি নাই, কিন্তু আজ রামের হাতে মরিল বলিয়া, সে স্বর্গে গেল।

রাম ও তাড়কার যুদ্ধ দেখিয়া মুনি ভয়ে প্রায় জ্ঞানশূন্য হইয়া বনের এক কোণে পলাইয়াছিলেন। তাড়কাকে মারিবার পর, রাম ও লক্ষ্মণ দুই ভাই, অনেক খুঁজিয়া মুনিকে বাহির করিলেন। ভয়ে মুনি একেবারে জড়সড় যেন অজ্ঞান, রাম ও লক্ষ্মণ অনেক সেবা করার পর, মুনির চৈতন্য হইল। তাড়কা মরিয়া গিয়াছে শুনিয়া, মুনি রামকে আশীর্ব্বাদ করিলেন।

তৎপরে মুনি তাহাদিগকে সঙ্গে করিয়া পবনের জন্মভূমি অর্থাৎ যেখানে উনপঞ্চাশ পবন জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন সে স্থান দেখাইলেন। ইহার পরে সকলে গৌতমের তপোবনে, যেখানে অহল্যা গৌতমের শাপে পাষাণী হইয়া পড়িয়াছিলেন, তথায় উপস্থিত হইলেন এবং অহল্যার সেই পাষাণময়ী দেহে পা দিবার জন্য বিশ্বামিত্র রামচন্দ্রকে আদেশ করিলেন। রাম অহল্যার শরীরে পা দিবামাত্র অহল্যা পূর্ব্বশরীর প্রাপ্ত হইল। অতঃপর তাঁহারা সকলে বিশ্বামিত্রের আশ্রমে উপস্থিত হইলেন।

আর আর মুনিরা রাম লক্ষ্মণকে পাইয়া,বড় আনন্দের সহিত যজ্ঞ আরম্ভ করিলেন। এদিকে মারীচ ও সুবাহু আবার যজ্ঞের সন্ধান পাইয়া, দলবল সঙ্গে করিয়া আকাশ দিয়া আসিতে লাগিল। রাক্ষসেরা বড় মায়া জানে। তাহারা আকাশেও যাইতে পারে। জলের ভিতর ও যাইতে পারে। আকাশ জুড়িয়া রাক্ষসের দল আসিতেছে দেখিয়া, মুনিরা বলিলেন, রাম! এইবার রাক্ষসেরা

পাষাণী অহল্যা।

আসিতেছে, বেশ সাবধানে যুদ্ধ কর, দেখিও যেন যজ্ঞনষ্ট না হয়। রাক্ষসেরা আকাশে থাকিতেই, রাম তাহাদের উপর বাণ ছাড়িলেন, বাণের উপর বাণ, তীরের উপর তীর, মারিতে লাগিলেন। রাক্ষসের দল ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গেল, কাহার সাধ্য রামলক্ষ্মণের বাণের সম্মুখে দাঁড়ায়। সিংহের সম্মুখে শৃগালের দল কতক্ষণ থাকিতে পারে! মারীচ ও সুবাহু বাণ খাইয়া পলাইল। আর আর রাক্ষসের ত কথাই নাই, যে, যে দিকে পারিল প্রাণ লইয়া পলায়ন করিল। মুনিদের যজ্ঞে কোন বাধা হইল না। মুনিরা সকলেই রাম লক্ষ্মণের উপর বড় সন্তুষ্ট হইলেন। রাম লক্ষ্মণও মুনিদিগের কার্য্য করিয়া আনন্দিত হইলেন।

রাম লক্ষ্মণ রাজার ছেলে, তাঁহাদের রাজার ঘরে বাস, উত্তম বিছানায় শয়ন ও নানারূপ ভাল দ্রব্য আহার করা অভ্যাস, আজ তাঁহারা বনে গাছের তলায়, মুনিদিগের পাতার কুঁড়ে ঘরে, বনের ফলমূল খাইয়া কত আনন্দিত হইলেন ও প্রফুল্ল মনে সেদিন তথায় থাকিলেন।

পর দিন প্রাতঃকালে বিশ্বামিত্র রাম ও লক্ষ্মণকে সঙ্গে লইয়া মিথিলায় চলিলেন। মিথিলায় জনক নামে একজন রাজা ছিলেন। তাঁহার ছেলে মেয়ে ছিল না। সে কালের রাজারাও লাঙ্গল চষিতেন। এক দিন জনক রাজা লাঙ্গল চষিবার সময়, লাঙ্গলের ফালের অর্থাৎ ফলার মাথায়, একটী সুন্দরী কন্যা উঠিল। রাজা জনক সেই কন্যাটীকে বাড়ী লইয়া গেলেন ও নিজের কন্যার মত লালনপালন করিতে লাগিলেন এবং তাহার

নাম সীতা রাখিলেন। রাজা জনক শিবের ভক্ত ছিলেন। তাঁহার ঘরে শিবের এক প্রকাণ্ড ধনুক ছিল। তিনি পণ রাখিলেন, যে রাজপুত্র এই ধনুক ভাঙ্গিতে পারিবে, তাহার সহিত সীতার বিবাহ দিবেন। সীতা ক্রমে জনকের ঘরে বড় হইতে লাগিলেন। বিবাহের বয়স হইয়াছে দেখিয়া রাজা জনক অনেক স্থানে নিমন্ত্রণের পত্র দিলেন, অনেক রাজা আসিলেন, কিন্তু সেই প্রকাণ্ড ধনুক ভাঙ্গা দূরে থাক, কেহ তাহা নাড়িতেও পারিলেন না।

মুনি বিশ্বামিত্র পথেই রামকে ধনুকের কথা, ও সীতার কথা বলিয়া, ধনুক ভাঙ্গিবার জন্য উপদেশ দিয়াছিলেন। তার
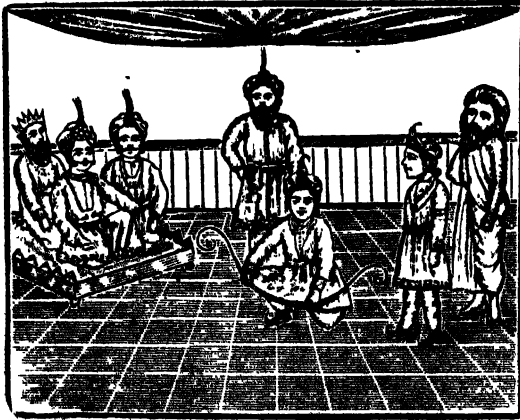
রাম শিবের ধনুক ভাঙ্গিতেছেন।

পর রাম ও লক্ষ্মণ উভয়ে, মিথিলায় জনকের সভায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। রাজা জনক বিশ্বামিত্রকে পূজা ও প্রণাম করিলেন। তার পর রাম বিশ্বামিত্রের অনুমতি লইয়া, ধনুক-

খানি তুলিয়া অনায়াসে তাহাতে গুণ দিলেন ও মহাশব্দে মড় মড় করিয়া ধনুকখানি ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন। ধনুক ভাঙ্গার শব্দে সভার সকল রাজারা অজ্ঞান হইয়া পড়িলেন, এবং চারিদিক্ একেবারে নিস্তব্ধ হইয়া গেল। রাজা জনক নিজের পণ পূর্ণ হইল দেখিয়া, অত্যন্ত আহ্লাদিত হইলেন। এবং মহাঘটায় সীতার বিবাহের উদ্যোগ করিলেন। তার পর রাজা দশরথকে আনিবার জন্য অযোধ্যায় লোক পাঠাইলেন।

রাজা দশরথ সংবাদ পাইয়া বড়ই আহ্লাদিত হইলেন, এবং পুরোহিত, মন্ত্রী ও পাত্র মিত্র প্রভৃতিকে লইয়া মহা ধূমধামে মিথিলায় চলিলেন, দশরথের লোক জন, হাতী ঘোড়া, দাস দাসী প্রভৃতিতে এক খানি বড় সহরের মত হইল, এবং তাহারা মিথিলায় আসিলে, মিথিলা পূরিয়া গেল। রাজা জনক মিথিলার বাহিরে, অনেক দূর হইতে, দশরথকে আদর করিয়া, যত্নের সহিত মিথিলার ভিতর লইয়া গেলেন ও সকলকে থাকিবার জন্য সুন্দর সুন্দর স্থান দিলেন। তার পর ভাল দিন দেখিয়া সীতার সহিত রামের, এবং তাঁহার আর একটী কন্যা উর্ম্মিলার সহিত লক্ষ্মণের ও ভ্রাতা কুশধ্বজের দুইটী কন্যা শ্রুতকীর্ত্তি ও মাণ্ডবীর সহিত ভরত ও শত্রুঘ্নের বিবাহ দিলেন। নিমন্ত্রিত রাজারাও এই রকমে মেয়ে চারিটীকে উপযুক্ত পাত্রে প্রদান করিতে দেখিয়া মহা আনন্দিত হইলেন। তাঁহারা যেমন তাহা-দের বিবাহ দেখিয়া আনন্দিত হইয়াছিলেন, তেমনই আবার নানা রূপ অতি উপাদেয় খাদ্যদ্রব্য পাইয়া আরও আনন্দিত

হইয়াছিলেন। নানারূপ তামাসা, বাজী, বাজনা, নাচ, গানও যথেষ্ট হইয়াছিল।

তারপর রাজা দশরথ ছেলে ও বধূ লইয়া, অযোধ্যায় চলিলেন। পথে আর এক বিপদ্ উপস্থিত হইল! পরশুরাম নামে একজন মহা বীর ছিলেন। তিনি একুশবার ক্ষত্রিয়দিগকে বধ করেন। তিনি ক্ষত্রিয় জাতির মহাশত্রু ছিলেন। একজন ক্ষত্রিয় রাজপুত্র হরধনুক ভঙ্গ করিয়া সীতাকে বিবাহ করিয়াছে শুনিয়া, পরশুরাম রাগে জ্বলিয়া উঠিলেন। কুঠার তাঁহার প্রধান অস্ত্র ছিল। তিনি কুঠার কাঁধে করিয়া মহাবেগে আস্ফালন করিতে করিতে, আসিয়া উপস্থিত হইলেন। পরশুরামের তর্জ্জন গর্জ্জন দেখিয়া রাজা দশরথের বড় ভয় হইল। রাম শান্তভাবে ধনুকে গুণ দিয়া যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইলেন। কিন্তু পরশুরামের উপর রাম বাণ ছাড়িলে পরশুরামের জীবন নষ্ট হয়, এজন্য তাহা না করিয়া তিনি বাণটীকে স্বর্গের দিকে ছাড়িলেন ও পরশুরামের স্বর্গে যাইবার পথ নষ্ট করিলেন।

তারপর রাজা দশরথ মহা আনন্দে অযোধ্যায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। অযোধ্যার লোকেরা তাহাদের রাজার আনন্দে আনন্দিত হইয়া নৃত্য করিতে লাগিল। কৌশল্যা, কৈকেয়ী ও সুমিত্রার আনন্দের সীমা নাই; পুত্রবধূ পাইয়া তাঁহারা তাহাদিগকে আপন মেয়ের ন্যায় স্নেহ করিতে লাগিলেন। এই প্রকারে কিছু দিন অযোধ্যায় বড় আমোদ চলিল। ইহার কএক দিন পরে ভরত ও শত্রুঘ্ন মামার বাড়ী গেলেন।

অযোধ্যাকাণ্ড।

—:০:—

কিছু দিন পরে রাজা দশরথ খুব বড় একটা সভা করিলেন। অনেক রাজা, রাজপুত্র, মন্ত্রী, পুরোহিত ও প্রজাগণ সকলেই সেই সভায় আসিয়াছিলেন। সেই সভায় রাজা দশরথ বলিলেন, আমি অনেক দিন রাজ্যপালন করিতেছি, এখন বুড়া হইয়াছি, অনেক কাজে কষ্ট বোধ হয়, সকল কাজে সকল সময় উচিত অনুচিত বিবেচনা করিতে পারি না। আমার বড় ছেলে রামকে সকলেই জানে, রাম দেখিতেও যেমন সুন্দর, লেখা পড়া ও আর আর গুণও তেমনই হইয়াছে। এক্ষণে আমার এই রাজ্য পালনের ভার, রামের উপর দিয়া, রামকে রাজা করিতে ইচ্ছা করি ও আমি কিছুদিন নির্ভাবনায় ধর্ম্মকার্য্য করিব মনে করিয়াছি। এই কথা শুনিয়া সভাস্থ সকলেই একস্বরে উত্তর করিলেন, রাম রাজা হইবার উপযুক্ত। রামকে রাজা করুন, আমরা কিছু দিন নূতন রাজার রাজ্যে বাস করি। রাজা দশরথ দেখিলেন ইহাতে কাহারও অমত নাই। সকলেই রামকে রাজা দেখিতে চায়, এজন্য বশিষ্ঠ মুনির উপদেশ মত পরদিন রামকে রাজা করিবার জন্য দিন স্থির করিলেন এবং প্রজাদিগকে সমস্ত দিন রাত, আমোদ আহ্লাদ করিতে হুকুম দিলেন।

কাল রাম রাজা হইবে, এই আনন্দে সকলেই বিভোর, আমোদ প্রমোদের ত কথাই নাই, অযোধ্যা লোকে লোকারণ্য, কি যেন একটা নূতন আনন্দের দিন আসিতেছে। সকলেই রামকে রাজার সিংহাসনে বসিতে আগে দেখিবে বলিয়া ব্যস্ত। রাজবাড়ীর বাহিরে ভিতরে গ্রামে নগরে সকল স্থানেই রাম রাজা হইবেন এই সংবাদ পৌঁছিল এবং সকল স্থানই আনন্দময় হইয়া উঠিল। বহুদূর হইতে কেবল অযোধ্যার দিকেই লোকের স্রোত আসিতেছে। রাজবাড়ীর দরজা, নানারকম ফুলের মালা ও সুন্দর সুন্দর লতা পাতা দিয়া সাজান হইতেছে, রাত্রিতে বাড়ী বাড়ী আলো দিবার জন্য কত লোক খাটিতেছে। অযোধ্যায় সকলই যেন নূতন নূতন বলিয়া বোধ হইতেছে। অযোধ্যায় কি যেন একটা নূতন কাণ্ড উপস্থিত বলিয়া মনে হইতেছে।

রাজার বাড়ীর ভিতরে রাণীদিগেরও আজ খুব আমোদের দিন, এতদিন তাঁহারা রাজার স্ত্রী ছিলেন, আজ তাঁহারা রাজার মা হইবেন। এই শুভদিনে কত গরীব দুঃখী তাঁহাদিগের নিকট হইতে কত জিনিস চাহিয়া লইতেছে এবং তাঁহারাও ইচ্ছা করিয়া কত খাবার জিনিস, কত কাপড় ও কত টাকাকড়ি বিলাইতেছেন। রাম কৌশল্যার ছেলে, কিন্তু কৈকেয়ী ও সুমিত্রারাণী, আপনার ছেলে ভরত শত্রুঘ্ন অপেক্ষা, রামকে অধিক স্নেহ করিতেন। এজন্য তাঁহারাও রাম রাজা হইবে শুনিয়া কৌশল্যার মত আনন্দে ভাসিতেছেন।

কৈকেয়ীর মন্থরা নাম্নী একটা কুঁজো দাসী ছিল, তাহার মনটি বড় কু ; রাম রাজা হইবে, ভরত হইবে না, ইহা তাহার প্রাণে সহিল না ; সে মনে মনে নানা রকম কু-পরামর্শ স্থির করিয়া কৈকেয়ীর ঘরে আসিয়া দেখিল, কৈকেয়ী আমোদে বিভোর হইয়া পড়িয়াছেন। ইহাতে তাহার সর্ব্বশরীর রাগে জ্বলিয়া উঠিল। তখন সে কৈকেয়ীকে জিজ্ঞাসা করিল, আজ তোমার এত আমোদ কিসের ? কৈকেয়ী উত্তর করিলেন, "জানিস্ না ! কাল যে রাম রাজা হইবে"। শুনিয়া মন্থরা বলিল "আপন ভাল পাগলেও বুঝে। রাম রাজা হইবে আর ভরত তাহার চাকর হইয়া থাকিবে, রামের হুকুমে রাজ্যশুদ্ধ লোক চলিবে, আর ভরতের কথায় কেহ কাণও দিবে না, ক্রমে ক্রমে সকলেই রামের সহায় হইয়া দাঁড়াইবে, ভরতের পক্ষে কেহ থাকিবে না। ভরতের ছেলে পিলে হইলে, তাহারা রাজ্যের সম্পর্কেও থাকিতে পারিবে না। "আপন ভাল মন্দ পাগলেও বুঝে"। তুমি যে পাগলের চেয়েও বোকা, এ সব কথা কি আর বেশী

কুঁজো দাসী মন্থরা।

বলিতে হয়, না বুঝাইতে হয়। তাই বলি এখনও হাত আছে, যাহাতে নিজের ভাল হয়, বুঝিয়া এমন কাজ কর; আমার বুদ্ধিতে চল, আমি যা বলি ঠিক সেই রকম কর, তাহা হইলেই তোমার মঙ্গল; নইলে তোমার দুঃখের শেষ থাকিবে না, চিরকাল কাঁদিয়া মরিবে। আমি তোমার দাসী, তোমারই লোক, যাহাতে তোমার ভাল হইবে তাহাই বলিব, আমার কথার অন্যথা করিও না। রাম তোমার সতীনের ছেলে, আর ভরত তোমার পেটের ছেলে। রাম রাজা না হইয়া ভরত রাজা হইলে, তোমার কত বেশী সুখ বাড়িবে তাহা তুমি বুঝিতেছ না। রাম রাজা হইলে কৌশল্যা রাজমাতা হইবে, তুমি রাজার বিমাতা হইবে, তোমার চেয়ে কৌশল্যার মান ক্রমে বাড়িয়া উঠিবে ও তোমার মান ক্রমে লোপ পাইবে। এখনও বুঝিয়া চলিলে, তোমার সকল ভয়, সকল বিপদ্ কাটিয়া যাইবে।

কৈকেয়ী মন্থরার মুখে রামের রাজ্যাভিষেকের কথা শুনিয়া আহ্লাদে গদ গদ হইয়া নিজ গলার মুক্তা-হার তাহাকে দিতে গেলেন, ইহাতে মন্থরা আরও কুপিতা হইয়া তাহাকে গালি দিতে দিতে সেস্থান হইতে চলিয়া যাইতে উদ্যতা হইল; কৈকেয়ী দাসীটীকে বড়ই ভালবাসিতেন, তাহার রাগ দেখিয়া তিনি তাহাকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য অনেক অনুরোধ করিয়া ফিরাইলেন।

তখন সুযোগ বুঝিয়া মন্থরা তাহাকে নানাপ্রকার কু-মন্ত্রণা দিতে আরম্ভ করিল।

কৈকেয়ী ও মন্থরা।
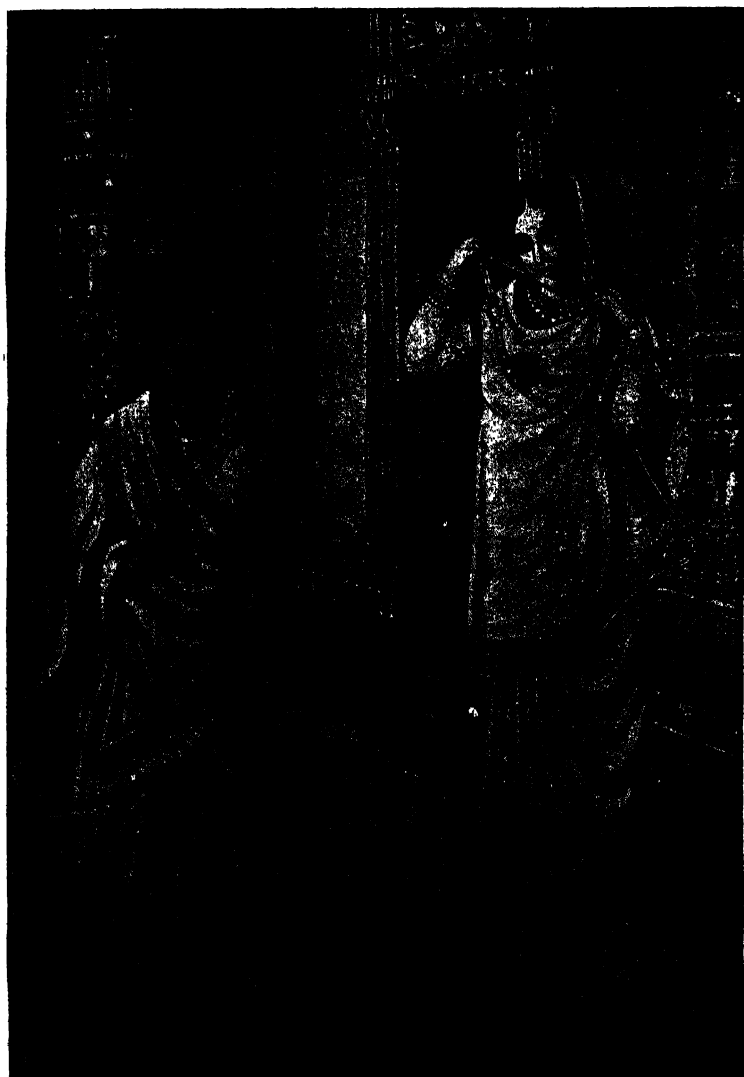
মন্থরা কৈকেয়ীকে এই প্রকার অনেক কু-মন্ত্রণা দিল। কৈকেয়ী স্ত্রীলোক, স্ত্রীলোকের মন বড়ই অস্থির, ভাল কথা সহজে বুঝিতে চায় না, আগে মন্দটী দেখে। শেষে কৈকেয়ী মন্থরার এই মন্দ পরামর্শে মন দিল এবং কি রকমে ভরতের ভাল হইবে তাহাই ভাবিতে লাগিল। মন্থরার একটি কুঁজ ছিল, সেটা দুষ্ট বুদ্ধিতে ভরা ; আরও বিশেষ, যে সকল দাসীর দুষ্ট বুদ্ধি আছে, তাহারা বড় ভয়ানক লোক হয়। তাহারা না পারে এমন কাজ নাই। মন্থরার কুঁজ হইতে দুষ্ট বুদ্ধিগুলি বাহির হইতে লাগিল।

মন্থরা একটু ভাবিয়া বলিল, 'বেশ হইয়াছে' রাজা দশরথ যে সময় শম্বর অসুরের যুদ্ধ হইতে আসিয়াছিলেন, তখন তাহার অস্ত্রের আঘাতে রাজা নিতান্ত কাতর ছিলেন, সেই সময় তুমি তাঁহাকে অনেক সেবা শুশ্রূষা করিয়াছিলে, তাহাতে রাজা সন্তুষ্ট হইয়া তোমার নিকট সত্য করিয়াছিলেন যে, তোমাকে দুইটী বর দিবেন। তুমি এখন সেই বর দুইটি চাও। তাহার এক বরে ভরতকে রাজা করিতে হইবে ও অন্য বরে রামকে চৌদ্দ বৎসরের জন্য বনবাস দিতে হইবে। চৌদ্দ বৎসর পরে রামকে আর বন হইতে ফিরিয়া আসিতে হইবে না এবং ফিরিলেও ভরতের নিকট হইতে রাজত্ব লইতে পারিবে না। রাজা তোমার নিকট প্রতিজ্ঞা করিয়া বর দিতে চাহিয়াছেন, ধর্ম্মের ভয়ে রাজা তাহা অস্বীকার করিতে পারিবেন না। সকল দিকেই সুবিধা হইয়াছে, কিন্তু এরকম সোজা ভাবে রাজাকে বলিলে

হইবে না, গায়ের সমস্ত গহনা খুলিয়া ফেল, একখানা ছেঁড়া ও ময়লা কাপড় পর এবং ক্রোধাগারে যাইয়া মাটিতে শুইয়া কান্দিতে আরম্ভ কর, রাজা তোমার সহিত আলাপ করিতে আসিলে তুমি সহজে রাজার কথায় উত্তর দিও না, রাজা যখন বড়ই ব্যস্ত হইবেন তখন তাঁহার নিকট বর চাহিবে; কিন্তু দেখিও রাজার কান্নায় ভুলিয়া যেন নিজের কথা ভুলিও না। আমি এখন চলিলাম, যাহা বলিতেছি তাহার অন্যথা করিও না।

এই বলিয়া মন্থরা চলিয়া গেল। কৈকেয়ী মন্থরার উপদেশ গুলি একে একে পালন করিতে আরম্ভ করিল। প্রথমে গায়ের গহনাগুলি সব খুলিয়া ফেলিল, তারপর একখানি খারাপ কাপড় পরিয়া, ক্রোধাগারে গিয়া মাটীতে শয়ন করিল এবং কিরূপে রামকে বনবাস দিয়া ভরতকে রাজা করিবে, তাহাই ভাবিতে লাগিল।

রাজা দশরথ বাড়ার ভিতর আসিয়া দেখিলেন, কৈকেয়ীর ঘরে কেহ নাই; খুজিয়া দেখিলেন, কৈকেয়ী ক্রোধাগারে গিয়া ময়লা কাপড় পরিয়া মাটিতে শুইয়া পড়িয়া আছেন। রাজা কারণ বুঝিতে পারিলেন না, জিজ্ঞাসা করিয়াও উত্তর পাইলেন না। অনেক চেষ্টাতেও কিছুই বুঝিতে না পারিয়া বলিলেন, তোমার এরূপ ভাবের কারণ কি? আমি স্বীকার করিতেছি, তুমি যাহা বলিবে, আমি তাহাই করিব। শুনিয়া কৈকেয়ী কান্দিতে কান্দিতে বলিলেন, আপনি শম্বর অসুরের যুদ্ধ হইতে আসিয়া পীড়িত হইয়াছিলেন ও আমার সেবা শুশ্রূষায় সন্তুষ্ট হইয়া

আমাকে দুইটী বর দিতে চাহিয়াছিলেন, আমি আজ সেই বর দুইটী চাহিতেছি, তাহার এক বরে ভরতকে রাজা করুন ও অন্য বরে রামকে চৌদ্দ বৎসর বনবাসে থাকিতে আদেশ দেন।

দশরথ ও কৈকেয়ী।

রাম সকলের চেয়ে গুণবান্ ও প্রথম ছেলে, এজন্য দশরথ রামকে ছাড়িয়া একটুও থাকিতে পারিতেন না, সেই রামের বনবাসের কথায়, তিনি অজ্ঞান হইয়া মাটীতে পড়িলেন। কাল রাম রাজা হইবে, রাজ পোষাক পরিয়া সিংহাসনে বসিবে, তাহার

বদলে, জটা বাকল পরিয়া তাহাকে বনে যাইতে হইবে। রাজা হইলে, রাজপ্রাসাদে বাস করিতে হইত, তাহা না হইয়া গাছের তলায় থাকিতে হইবে, রাজভোগের বদলে গাছের ফল খাইয়া বাঁচিতে হইবে। ইহা কি কম কষ্টের কথা, ভাবিলেও মাথা ঘুরিয়া যায়। কৈকেয়ীর কথাগুলি দশরথের বুকে শেলের ন্যায় বিঁধিল। কিছুক্ষণ পরে জ্ঞান হইল, তিনি কান্দিতে কান্দিতে বলিতে লাগিলেন, বৎস রাম! আমি তোমার চিরশত্রু, তোমাকে রাজা করিব মনে করিয়াছিলাম তাহাতে কি বিষম বাধা লাগিল। কৈকেয়ি! তুমি আর যাহা চাও তাহাই পাইবে, রামকে বনে দিও না। রাম বনে গেলে আমি একদিনও বাঁচিব না, তোমার দুঃখের অবধি থাকিবে না।

কৈকেয়ী কিছুতেই শুনিবার নয়। তিনি যাহা বলিয়াছেন তাহা করিতেই হইবে, না হইলে অধর্ম্ম হইবে। কৈকেয়ী রামকে ডাকিয়া বলিলেন, রাম! তোমার চৌদ্দ বৎসর বনবাসে যাইতে হইবে। রাম পিতার দশা দেখিয়া ও সমস্ত কথা শুনিয়া তখনই বনে যাইতে স্বীকার করিলেন। লক্ষ্মণ রামের পাশে দাঁড়াইয়া ছিলেন। রাগে তাঁহার সর্ব্বশরীর কাঁপিতে লাগিল, রামকে জিজ্ঞাসা না করিয়া তিনি কখন কোনও কাজ করেন না, তাহা না হইলে এতক্ষণ একটা তুমুল কাণ্ড বাধিত। রাম রাজা হইবেন এই আমোদেই সকলে আনন্দিত আছে, হঠাৎ তাঁহার বনে যাইবার সংবাদে একেবারে সকলের আমোদ ঘুচিয়া গেল, সকলেই কাঁদিতে লাগিল, আর বলিতে লাগিল, হায়! আমাদের

কি হইবে, আমাদের কপাল বড়ই মন্দ। আমরা একদিনও রামরাজ্যে বাস করিতে পারিলাম না। এই কথা বলিয়া সকলেই বিলাপ করিতে লাগিল।

এদিকে রাম বনে যাইবার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। লক্ষ্মণ রামের বড়ই অনুগত। তিনি রামকে ছাড়িয়া থাকিবেন না, সুতরাং লক্ষ্মণ ধনুক ও তীর লইয়া বনে যাইবার জন্য সাজিলেন, সীতা স্ত্রীলোক, পতি ভিন্ন স্ত্রীলোকের আর গতি নাই, এজন্য সীতা রামের সঙ্গে যাইবেন স্থির হইল। বনে বাস করা বড় কষ্ট ও বিপদ্। বাঘ, ভালুক, রাক্ষস প্রভৃতির উৎপাতে বনে থাকা বড় কঠিন এই প্রকার ভয় দেখাইয়াও রাম সীতাকে থামাইতে পারিলেন না। রাজার সারথি সুমন্ত্র, রথ সাজাইয়া আনিল ; রাম, সীতা ও লক্ষ্মণ বনে যাইবার জন্য রথে চড়িলেন, রথ চলিল। অযোধ্যার প্রজারা রামকে বড় ভালবাসিত, রামের সঙ্গে আমরাও বনে যাইব, বলিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে রথের পিছু পিছু ছুটিল। তাহাদের কান্নার শব্দে রাম নিতান্ত ব্যাকুল হইলেন ; এবং রথ হইতে অবতরণ করিয়া, তাহাদের সহিত হাঁটিয়া সরযূ নদীর তীর পর্য্যন্ত আসিলেন। সেই দিন রথ সেইখানেই থামিল। সকলে সে রাত্রি তথায় বিশ্রাম করিতে লাগিলেন।

অরণ্যকাণ্ড।

—ঃ * ঃ—

প্রভাত হইলে অযোধ্যার লোকেরা জাগিবে ও রামের সহিত বন পর্য্যন্ত যাইবে, এই ভয়ে রাত্রিতে সকলে ঘুমাইলে, রাম লক্ষ্মণ ও সীতা কাহাকেও কিছু না বলিয়া চুপে চুপে নদী পার হইয়া চলিয়া গেলেন।

নদী পার হইয়া সেদিন তাঁহারা পদব্রজে অনেক পথ চলিয়া সন্ধ্যাকালে গুহক চণ্ডালের বাড়ীতে আসিয়া

গুহকের কুটীরে রাম, লক্ষ্মণ, সীতা।

উপস্থিত হইলেন। গুহক প্রাণপণে তাঁহাদের সেবা শুশ্রূষা করিল। সে রাত্রি তাঁহারা গুহকের অতিথি হইয়া থাকিলেন, ও আলাপ পরিচয় হইয়া ক্রমে রাম গুহকের সহিত মিত্রতা করিলেন। রামের সহিত মিত্রতা হওয়ায় গুহক মহা আনন্দিত হইল। পরদিন প্রাতঃকালে রাম, লক্ষ্মণ ও সীতা গুহকের বাড়ীতেই বাকল পরিলেন এবং মাথার চুলে বটের আটা দিয়া জটা করিলেন। এখন যথার্থই বনবাসী সাজিলেন এবং গুহকের নিকট হইতে বিদায় হইয়া, ভরদ্বাজ মুনির আশ্রমের দিকে যাইতে লাগিলেন। ভরদ্বাজ মুনির আশ্রমে তাঁহারা এক দিন থাকিলেন, ও মুনির নিকট বনবাসে থাকিবার পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিলেন। ভরদ্বাজ মুনি বলিলেন, দণ্ডকারণ্যের মধ্যে পঞ্চবটী নামে একটী বন আছে,সে স্থান অতি-মনোরম, আপনারা সেই স্থানে থাকিবেন। এই কথা শুনিয়া, সকলে মুনিকে প্রণাম করিয়া, তথা হইতে দণ্ডকবনে যাত্রা করিলেন এবং ক্রমে পঞ্চবটীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তথায় লক্ষ্মণ গাছের পাতা কুড়াইয়া আনিয়া দুইখানি পাতার কুড়ে প্রস্তুত করিলেন, তাহার একখানিতে রাম ও সীতা এবং অপর খানিতে লক্ষ্মণ বাস করিতে লাগিলেন। প্রাতঃকালে লক্ষ্মণ বন হইতে ফলমূল আনিয়া রামকে দেন ও তাঁহারা তাহাই খাইয়া জীবন ধারণ করেন। বনের চারিদিক্ হইতে আসিয়া হরিণ ও অন্যান্য পশুপক্ষীরা তাঁহাদের কুড়ের চারিদিকে বেড়াইয়া বেড়ায়, প্রাতঃকালে পাখীর শব্দে তাঁহাদের ঘুম ভাঙ্গে, বনের সুগন্ধি বাতাস তাঁহাদিগকে আনন্দিত করে, বনের নানা

রকম ফুল ও ফল তুলিয়া সীতা খেলা করেন। এইরূপে তাঁহারা রাজ্যসুখ ভুলিয়া গেলেন, এবং পঞ্চবটী বনে মহা আনন্দে দিন কাটাইতে লাগিলেন। ইহা যেন তাঁহাদের জীবনে এক নূতন জিনিষ হইয়া উঠিল।

এদিকে সরযূ নদীর তীরে যাহারা নিদ্রিত ছিল, তাহারা পরদিন প্রাতঃকালে উঠিয়া, কেহই রাম, লক্ষ্মণ ও সীতাকে দেখিতে পাইল না, তখন সকলেই সুমন্ত্রের সহিত কান্দিতে কান্দিতে অযোধ্যায় ফিরিয়া আসিল।

রাম বনে যাইবার সময় হইতেই রাজা দশরথ এক একবার অজ্ঞান হইতেছেন ও মধ্যে মধ্যে এক একবার 'হা রাম! হা রাম!' বলিতেছেন। সুমন্ত্র ফিরিয়া আসিলে, তাহার নিকট রামের সংবাদ জিজ্ঞাসা করিলেন। সুমন্ত্রও পথে যাহা যাহা ঘটিয়াছিল সমস্তই বলিলেন। তখন দশরথ 'হা রাম! হা রাম!' বলিতে বলিতে প্রাণত্যাগ করিলেন।

রাজার মৃত্যুর পর, কৈকেয়ী ভিন্ন আর আর রাণীরা সকলে শোকে অস্থির হইয়া উঠিলেন। একে রাম বনে যাওয়াতেই তাঁহারা মরার মত হইয়াছিলেন,তার উপর পুনরায় স্বামীর মৃত্যু। পর পর দুইটী শোকে তাঁহাদেরও জীবন যায় যায় হইয়া উঠিল। বশিষ্ঠ রঘুবংশের গুরু। তিনি এই বিপদের সময় সকলকে সুস্থ করিতে লাগিলেন। ভরত এবং শত্রুঘ্নকে মাতুলালয় হইতে আনিবার নিমিত্ত শীঘ্র লোক পাঠাইলেন।

ভরত, শত্রুঘ্ন বাড়ী আসিলে, শাস্ত্রমতে দশরথের শ্রাদ্ধ

প্রভৃতি হইয়া গেল। ভরত কৈকেয়ীর কথা শুনিয়া বড়ই অসন্তুষ্ট হইল। কৈকেয়ী ভরতের জননী, সুতরাং তাঁহাকে কিছুই বলিতে পারিলেন না। নচেৎ হয়ত কৈকেয়ীকে তিনি মারিয়া ফেলিতেন। ভরত রাজা হইতে স্বীকার করিলেন না। রামকে বন হইতে ফিরাইয়া আনিবার জন্য, ভরত লোকজন সঙ্গে করিয়া বনে চলিলেন। সরযূ পার হইয়া গুহক চণ্ডালের নিকট রামের সংবাদ পাইয়া দণ্ডকারণ্যমধ্যে প্রবেশ করিলেন এবং দূরে সমস্ত লোক রাখিয়া অতি দুঃখিতভাবে হাঁটিয়া কান্দিতে কান্দিতে রামের পাতার কুড়ের দিকে যাইতে লাগিলেন।

রাম বনে আসিয়া পাতার কুড়ে বাঁধিয়া বাস করিতেছেন। কুড়ের সম্মুখে একটী বেদী আছে। সময়ে সময়ে রাম তথায় বসিয়া সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত ধর্ম্ম কথায় সময় কাটান। তাঁহাদিগকে দেখিলে পরম ধার্ম্মিক ও বনবাসী বলিয়াই বোধ হইত। রাজার ছেলে বলিয়া কেহ হঠাৎ চিনিতে পারিত না। কেবলমাত্র তাঁহাদের চক্ষুর জ্যোতি ও শরীরের গঠন দেখিলেই রাজার ছেলে বলিয়া বোধ হইত।

ভরত যাইয়া রাম ও সীতার চরণে প্রণাম করিলেন। এবং তাঁহারাও ভরতকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। তারপর পিতার মৃত্যু সংবাদ শুনিয়া সকলেই মহাশব্দে কান্দিতে লাগিলেন। সে শব্দে বন শব্দময় হইয়া উঠিল, এবং বোধ হইতে লাগিল যেন, বন্য পশুরাও তাঁহাদের দুঃখে দুঃখিত হইয়া তাঁহাদিগের সহিত কাঁদিতেছে।

এই প্রকার অনেকক্ষণ কান্দিয়া, রাম, লক্ষ্মণ ও সীতা স্নান করিয়া রাজা দশরথের আত্মার মঙ্গলের জন্য তর্পণ করিলেন ও আর আর যাহা করিবার সমস্তই করিলেন। পরে তাঁহারা সকলে এক স্থানে আসিয়া বসিলে ভরত রামকে অযোধ্যায় ফিরিয়া যাইতে বলিলেন। ভরত আরও বলিলেন, যে তিনি কখনও রাজা হইবেন না, এবং রাম অযোধ্যায় ফিরিয়া না গেলে, সিংহাসন শূন্য থাকিবে ও রাজ্য একেবারে নষ্ট হইয়া যাইবে, ভরতও রামের সহিত বনে বাস করিবেন, অযোধ্যায় যাইবেন না।

রাম ভরতের কথা শুনিয়া তাঁহাকে বুঝাইতে লাগিলেন। দেখ ভাই ভরত! পিতা দশরথ, মা কৈকেয়ীর নিকট সত্য হইতে মুক্ত হইবার জন্য তাঁহাকে বর দিয়া, আমাকে বনবাস ও তোমাকে রাজ্য দিয়াছেন। আমরা যদি এখন তাঁহার আজ্ঞাপালন না করি, তাহা হইলে তিনি লোকের নিকট অধার্ম্মিক হইবেন; আরও দেখ, পুত্র হইয়া পিতার আজ্ঞা পালন না করা বড়ই পাপের কাজ, আমরা পিতার কথা না শুনিলে আর লোকে কখনও পুত্র কামনা করিবে না এবং আমাদেরও নরকে যাইতে হইবে। অতএব তুমি পিতার আজ্ঞায় অযোধ্যায় যাইয়া রাজ্যপালন কর, এবং আমি চৌদ্দ বৎসর বনবাসে থাকিয়া পুনরায়

রামের পাদুকা।

অযোধ্যায় আসিয়া রাজা হইব। তুমি ত জ্ঞাত আছ যে পিতার আজ্ঞা পালন করা সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য।

এইরূপে রাম ভরতকে বুঝাইলে, ভরত রামের কাষ্ঠপাদুকা (খড়ম) মাথায় করিয়া নন্দীগ্রামে ফিরিয়া আসিলেন এবং সেই পাদুকা সিংহাসনে রাখিয়া নিজে তাঁহার ভৃত্যের ন্যায় হইয়া রাজ্যপালন করিতে লাগিলেন।

ভরত গেলে পরে, রাম, লক্ষ্মণ ও সীতা দণ্ডকারণ্যে প্রবেশ করিলেন এবং তথায় একটা প্রকাণ্ড রাক্ষসের সহিত তাঁহাদের সাক্ষাৎ হইল। তাহার নাম বিরাধ। রাক্ষসটার প্রকাণ্ড মাথা, লম্বা লম্বা হাত, বড় বড় চোক, লম্বা নাক, কুলোর মত কান ও বড় শালগাছের মত দেহ, দেখিলে ভয় হয়। বিরাধ রাম, লক্ষ্মণ ও সীতাকে আসিতে দেখিয়া তাঁহাদের দিকে দৌড়িয়া আসিল এবং সীতাকে ধরিয়া লইয়া চলিল। রাম ও লক্ষ্মণ অনেকক্ষণ তাহার সহিত যুদ্ধ করিলেন, কিন্তু তাহাতে বিরাধের কিছুই হইল না, শেষে রামলক্ষ্মণকেও কাঁধে তুলিয়া লইল। তাঁহারা বিরাধের কাঁধে বসিয়াই তাহার সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। তাহাতেও তাহার কিছু হইল না দেখিয়া রাম লক্ষ্মণ বিরাধকে ধরিয়া কোন রকমে তাহাকে মাটীতে পুতিয়া ফেলিলেন, তবে সেই মহাকায় ও মহা বলবান রাক্ষসের মৃত্যু হইল।

দণ্ডকারণ্যে অনেক মুনির আশ্রম ছিল। রামও তাঁহাদিগের ভিতর একখানি পাতার কুড়ে প্রস্তুত করিয়া তাহাতে বাস করিতে লাগিলেন। দণ্ডকারণ্যে রাক্ষসের উৎপাত বড় বেশী,

দণ্ডকারণ্যে রাম, লক্ষ্মণ ও সীতা।

শূর্পণখা নামে একটা রাক্ষসী প্রায়ই সেই বনে আসিয়া বেড়ায়। সে রাম ও লক্ষ্মণকে দেখিতে পাইয়া তাঁহাদের নিকটে আসিল এবং তাঁহাদিগকে বলিল, আমায় বিবাহ কর; আমার বিবাহ এখন হয় নাই। প্রথমে লক্ষ্মণ তাহার কথায় কাণ দিলেন না, পরে যখন সে বড় বিরক্ত আরম্ভ করিল, তখন তাহার কথায় অস্বীকার করিলেন। পরে রামের নিকটে গেলে রাম তাহাকে তাড়াইয়া দিলেন, শূর্পণখা অন্য উপায় না দেখিয়া ভাবিলেন, ইহার সহিত একটী স্ত্রীলোক আছে, ইহাকে খাইয়া ফেলিলে আমাকে বিবাহ করিবে। এই মনে করিয়া, সীতাকে খাইবার জন্য সীতার দিকে ছুটিল। অমনি লক্ষ্মণ ধনুকে বাণ দিয়া তাহার নাকটী কাটিয়া দিলেন। নাক দিয়া প্রবল বেগে রক্ত পড়িতে লাগিল। তখন যন্ত্রণায় শূর্পণখা অস্থির হইয়া কান্দিতে কান্দিতে পলায়ন করিল। তাহার যেমন কর্ম্ম তেমনই শাস্তি হইল। দণ্ডকারণ্যে জনস্থান নামে একটা স্থান আছে। সেই খানে শূর্পণখা বাস করে। তাহার আর দুইটী ভাই

নাক কাটা শূর্পণখা।

আছে। তাহাদের নাম খর ও দূষণ। তাহারাও তথায় থাকিত, শূর্পণখা চেঁচাইতে চেঁচাইতে তাহাদের নিকট যাইয়া কান্দিয়া পড়িল। খর ও দূষণ তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, কে তোমার এমন দশা করিল ? শূর্পণখা বলিল, এই দণ্ডকবনে রাম ও লক্ষ্মণ নামে রাজা দশরথের দুইটা ছেলে আসিয়াছে, তাহারা ধরিয়া আমার এ দুর্দ্দশা করিয়াছে। শূর্পণখার কথা শুনিয়া খর ও দূষণ দুই ভাই রাগে আগুন হইয়া উঠিল, এবং রাম ও লক্ষ্মণকে গিলিয়া ফেলিব বলিয়া তাহারা বেগে দণ্ডকারণ্যের দিকে ছুটিল। সেই অরণ্যের যেখানে যত রাক্ষস ছিল, শূর্পণখার নাক কাটার সংবাদ পাইবামাত্র, সকলেই খর ও দূষণের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইল। তখন দণ্ডকারণ্যে এক মহা যুদ্ধ বাধিল, রাম লক্ষ্মণের তীরের কাছে কার সাধ্য দাঁড়ায়। রাক্ষসের মুণ্ড ঘুরিয়া গেল, ঝড়ে ধূলারাশির মত রাক্ষসেরা, যে, যে দিকে পারিল পলাইয়া গেল। খর ও দূষণ দুই ভাই কোমর বাঁধিয়া অনেকক্ষণ যুদ্ধ করিল, কিন্তু সব বৃথা হইল। খর ও দূষণ অন্যান্য রাক্ষসদিগের মত বাণের আঘাতে মরিয়া গেল। কেবল অকম্পন নামে একটা রাক্ষস মরিল না। সে ছুটিয়া গিয়া রাবণকে এই সকল সংবাদ দিল। রাবণ রাক্ষসের রাজা। লঙ্কায় তাহার রাজধানী। জনস্থানের সকল রাক্ষস মরিয়া গিয়াছে এবং তাহার ভগ্নী শূর্পণখার এই প্রকার দুর্গতি করিয়াছে, ইহা শুনিয়া রাবণ কি স্থির থাকিতে পারে ? তখনই যুদ্ধে যাইবার উদ্যোগ করিল।

যুদ্ধের আয়োজন দেখিয়া অকম্পন বলিল, যুদ্ধে হঠাৎ কাজ

নাই, রাম লক্ষ্মণ বড়ই বলবান, তাহার সঙ্গে যুদ্ধে জিতিবে এমন সাধ্য কার? তাহাদের একবাণ শত সহস্র বাণ হইয়া চারিদিক ছাইয়া ফেলে, চন্দ্র সূর্য্যের মুখ দেখা যায় না, দিন রাত বুঝা ভার। তাহাদিগকে শাস্তি দিবার অন্য পথ আছে। তাহাদের সঙ্গে একটী সুন্দরী স্ত্রীলোক আছে, তাহার নাম সীতা, তুমি রাক্ষসের মায়া ধরিয়া, যদি সীতাকে আনিতে পার, তাহা হইলেই বেশ হয়। রাবণ পাপকার্য্যে বড়ই পটু। সুন্দরী স্ত্রী-লোকের কথা শুনিয়া, তাহার বড়ই লোভ হইল এবং মারীচ ও সুবাহু নামে দুইটা রাক্ষসকে ডাকিয়া দুইটী সোনার হরিণ হইয়া রামের কুড়ের চারিদিকে বেড়াইতে আদেশ করিল। তাহাকে আরও বলিয়া দিল সীতার কথায় যখন রাম তোমাদিগকে ধরিতে আসিবে, তখন তোমরা তাহাকে কুড়ে হইতে অনেক দূরে লইয়া যাইবে।

বিশ্বামিত্রের যজ্ঞের সময় মারীচ ও সুবাহু রাম লক্ষ্মণের পরিচয় পাইয়াছিল। তাঁহাদের বাণের কথা এখনও মন হইতে যায় নাই। আজ রাবণের কথায় বড়ই চিন্তিত হইল এবং তখনই দণ্ডকারণ্যে যাইয়া, দুই ভাই রাক্ষসের মায়ায় সুন্দর দুইটী সোনার হরিণ হইল। এমন সুন্দর হরিণ হইল যে, দেখিলেই ধরিতে ইচ্ছা হয়। হরিণ দুইটী ঘুরিয়া ঘুরিয়া রামের কুড়ের চারিদিকে বেড়াইতে লাগিল। সীতাকে দেখিলেই তাঁহার দিকে যায়। কখনও একটু নিকটে যায়, কখনও বা দূরে পালায়। একটী দূরে গেলে আর একটী তাঁহার নিকটে আসে কিন্তু কিছু-

তেই তাঁহার হাতের কাছে যায় না, কিংবা ধরা দেয় না। সীতা তখন রামকে হরিণ দুইটী ধরিয়া দিতে বলিলেন। রাম ধনুক ও তীর লইয়া তখনই হরিণ দুইটী ধরিবার জন্য বাহির হইলেন। লক্ষ্মণ সীতার নিকট রহিলেন। হরিণ মায়া করিয়া ক্রমে ক্রমে রামকে বনের অনেক দূরে লইয়া গেল। সুযোগ বুঝিয়া রাম যখন বাণ মারিলেন তখন তাহারা রামের ন্যায় স্বর করিয়া, "কোথা ভাই লক্ষ্মণ! আমার প্রাণ যায়" বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল।

সীতা ও সোনার হরিণ।

লক্ষ্মণ ও সীতা সেই কুড়ের ভিতর হইতে সেই চীৎকার শুনিতে পাইলেন। তখন সীতা রামের জন্য একেবারে অস্থির হইয়া উঠিলেন। কিন্তু লক্ষ্মণ বীরের ন্যায় অচল রহিলেন। তিনি জানিতেন সহজে রামকে কেহ কিছু করিতে পারিবে না।

সেই জন্যই তিনি স্থির ছিলেন। কিন্তু সীতা ইহা দেখিয়া লক্ষ্মণকে তিরস্কার করিতে লাগিলেন, সুতরাং তিনি ধনুক হাতে লইয়া সীতাকে সাবধানে থাকিবার জন্য অনুরোধ করিয়া রামের কাছে ছুটিলেন।

এদিকে রাবণ রথ লইয়া বনের আড়ালে দাঁড়াইয়া ছিল। অবসর বুঝিয়া, সে সন্ন্যাসীর বেশে আসিয়া সীতার নিকট উপস্থিত হইল, এবং নানাবিধ কথা সীতাকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল, তুমি এই বনে একা কেন? তোমার কি আর কেহ নাই? সীতার মন অতি সরল। দুষ্ট রাবণকে যোগী ও অতিথি মনে করিয়া তাড়াতাড়ি তাহাকে বসিতে কুশাসন দিলেন। রাবণ তথায় বসিয়া, ক্রমে ক্রমে যোগীর সাজ ছাড়িয়া, রাক্ষসের রাজা রাবণ হইল। রাবণের আকার দেখিয়া সীতা ভয়ে তথা হইতে ঘরের ভিতর আসিতে ছিলেন। এমন সময়ে রাবণ তাঁহার চুল ধরিয়া আনিল ও লঙ্কার দিকে রথ চালাইয়া দিল।

উপস্থিত বিপদে সীতার বুদ্ধি একেবারে লোপ পাইল। কি করিবেন কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। মনে মনে ভাবিলেন, যদি কোন বীর এই বনের ভিতরে থাকিতেন, তাহা হইলে এই সময় আসিয়া তাঁহাকে এই বিপদ্ হইতে উদ্ধার করিতে পারিতেন। স্ত্রীলোকের কান্না শুনিয়া,যদি কোন বলবান্ ব্যক্তি, এই স্থানে আইসেন এবং তাঁহাকে রাবণের হাত হইতে উদ্ধার করেন, এই ভাবিয়া সীতা উচ্চৈঃস্বরে কান্দিতে আরম্ভ কারলেন। কিন্তু সে বনে জনমানবের সম্পর্ক পর্য্যন্তও ছিল না।

তাঁহার কান্নায় কেহই তথায় আসিল না। বিপদের সময় তিনি রাবণ ছাড়া আর কাহাকেও সেখানে দেখিতে পাইলেন না।

সীতা ও রাবণ রথের উপরে।

তখন সীতা বিষম মনের কষ্টে গায়ের গহনা সকল খুলিয়া পথে ফেলিতে আরম্ভ করিলেন।

সেই বনে জটায়ু নামে একটা খুব বড় পাখী বাস করিত। জটায়ু দশরথের বন্ধু। সীতার কান্নার শব্দে জটায়ু রাবণের পাপ কার্য্য জানিতে পারিয়া, বেগে আসিয়া রাবণের রথের সম্মুখে উপস্থিত হইল। এবং সীতাকে সেই বিপদ্ হইতে উদ্ধার

করিবার জন্য, জটায়ু রাবণের সহিত মহাযুদ্ধ আরম্ভ করিল। পাখার বাতাসে রাবণের রথ উড়াইয়া দিবার চেষ্টা করিল। নখ ও ঠোঁটের আঘাতে রথের ঘোড়া ও রাবণকে অস্থির করিয়া তুলিল। জটায়ু পাখী হইলে কি হয়, তাহার শরীরে খুব জোর ছিল এবং সীতার বিপদ্ দেখিয়া তাহার বল আরও দ্বিগুণ হইয়া উঠিল। নিজের জীবনের মায়া না করিয়া, কিরূপে রাবণকে নিহত করিয়া সীতার উদ্ধার করিবে, তাহারই চেষ্টা করিতে লাগিল। রাবণও তীর ধনুক হাতে লইয়া জটায়ুর সহিত ভীষণ যুদ্ধ আরম্ভ করিল। এইরূপে দুইজনের তুমুল সংগ্রাম চলিতে লাগিল। জটায়ু পক্ষী, তাহার অস্ত্র শস্ত্র কেবলমাত্র নখ ও ঠোঁট, রাবণের চোকা চোকা বাণের কাছে সে কতক্ষণ দাঁড়াইবে! অতি অল্পক্ষণ পরেই রাবণ জটায়ুর নখ ও পাখা কাটিয়া মাটিতে ফেলিল। জটায়ু প্রাণে মরিল না বটে, কিন্তু একেবারে শক্তিহীন হইয়া মাটীতে পড়িয়া রহিল। রাবণ তখন প্রফুল্ল মনে সীতাকে লইয়া লঙ্কায় চলিয়া গেল। লঙ্কায় অশোকবন নামে একটা প্রকাণ্ড বন আছে। তাহাতে একটী কুটীর প্রস্তুত করিয়া, তাহার ভিতর সীতাকে আটকাইয়া রাখিল ও কতকগুলা রাক্ষসীকে পাহারা দিবার জন্য নিযুক্ত করিল।

এদিকে রাম ও লক্ষ্মণ দুই ভাই, সোনার হরিণ মারিয়া, কুটীরে ফিরিয়া আসিয়া দেখিলেন, তাহাতে সীতা নাই। সীতা জল আনিতে নদীতে গিয়াছেন, অথবা বনের ভিতর ফুল তুলিতে গিয়াছেন, এই মনে করিয়া চারিদিকে খুঁজিতে আরম্ভ করিলেন।

জটায়ুবধ।

কিন্তু সীতা তখন লঙ্কার অশোক বনে আটকান আছেন; পঞ্চবটীতে তাঁহার সন্ধান কিরূপে হইবে?

রাম লক্ষ্মণ দুই ভাই তখন বনের ভিতর প্রতি বৃক্ষের আড়ালে, প্রতি নিকুঞ্জে, ঘাটে, পথে, পর্ব্বতে সীতার জন্য ঘুরিয়া বেড়াইলেন, কিন্তু কোথাও সীতার সন্ধান পাইলেন না। শেষে হতাশ হইয়া, ঘুরিতে ঘুরিতে বনের ভিতর একস্থানে রামের সহিত জটায়ুর দেখা হইল, এবং জটায়ু রাজা দশরথের বন্ধু জানিয়া রাম ও লক্ষ্মণ তাহাকে প্রণাম করিলেন। পরে জটায়ুর মুখে, রাবণ সীতাকে হরণ করিয়া লইয়া গিয়াছে, এই সকল বৃত্তান্ত জানিলেন। তারপর রামের সম্মুখে, জটায়ুর মৃত্যু হইল। তখন রাম জটায়ুর দেহ স্পর্শ করিলেন। অমনি জটায়ু স্বর্গে গেল। জটায়ু স্বর্গে যাইবার সময়, রামকে বলিয়া গেল, বৎস রাম! তুমি ঋষ্যমূক পর্ব্বতে যাইয়া, বানরের রাজার সহিত বন্ধুত্ব কর, ও তাহাদের সাহায্যে সমুদ্র পার হইয়া, লঙ্কায় যাইও ও দুষ্ট রাবণকে সবংশে মারিয়া সীতার উদ্ধার কর।

রাম জটায়ুর সেই কথায় আশা পাইয়া, কাঁদিতে কাঁদিতে লক্ষ্মণকে বলিলেন, দেখ ভাই লক্ষ্মণ! জটায়ু পক্ষী হইলেও পরম জ্ঞানী ও পিতার বন্ধু, তাহার উপদেশমত কার্য্য করিলে সীতাকে পাওয়া যাইবে। অতএব এক্ষণে যাহাতে ঋষ্যমূক পর্ব্বতের বানরদিগের সহিত বন্ধুত্ব হয়, এবং তাহাদের সাহায্যে সীতার উদ্ধার করিতে পারি, এস এখন কেবল তাহারই চেষ্টা করি।

লক্ষ্মণ রামের কথা শুনিয়া, বলিলেন দাদা! তাহার জন্য ভয়

কি? আমি জানি বানরেরা বড় কলা ভালবাসে। কএক কাঁন্দি পাকা কলা, তাহাদিগকে দিলেই, তাহারা তখনই আমাদের বন্ধু হইবে, এবং যখনই যাহা বলিব, তখনই তাহা করিবে। বানর বাধ্য করা কেবল কলারই কাজ। আপনি তাহার জন্য একটুও ভাবিবেন না। আমি এখনই বানরগুলিকে আপনার বশে আনিয়া দিতেছি। রাম বলিলেন, ভাই লক্ষ্মণ! তুমি ইহা যত সহজ মনে করিতেছ, বাস্তবিক ইহা তত সহজ নহে, ইহা বড় কঠিন কাজ। রাক্ষসের রাজা রাবণকে মারিয়া, সমুদ্র পারে লঙ্কা হইতে সীতার উদ্ধার করা, বড় সহজ কাজ নহে। দেবতাদিগের সাহায্য ভিন্ন একার্য্য কোনরূপে সফল হইবে না। যাহা হউক চল, ঋষ্যমূক পর্ব্বতে যাইয়া একবার চেষ্টা করিয়া দেখা যাউক।

কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড।

কএক দিন পরে, রাম ও লক্ষ্মণ ঋষ্যমূক পর্ব্বতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং তথায় বানরদিগের সহিত তাঁহাদের সাক্ষাৎ হইল। তাঁহারা দেখিলেন বানরদিগের রাজা বালী এবং তাহার ভ্রাতা সুগ্রীব, এই দুইজনের মধ্যে বড়ই শত্রুতা চলিতেছে। বালী সুগ্রীবকে রাজ্য হইতে তাড়াইয়া দিয়াছে। সুগ্রীব, হনুমান্ ও জাম্বুবান্ প্রভৃতি বানরগণের দলের বড় বড় বীর সকলকে লইয়া, বালীর নিকট হইতে রাজ্য কাড়িয়া লইবার উদ্যোগ করিতেছে। রাম দেখিলেন, এই সুগ্রীবকে হাত করিতে পারিলে, অনেক বড় বড় বীর বানরের সাহায্য পাওয়া যায় এবং সীতা উদ্ধারের বড়ই সুবিধা হয়। এই ভাবিয়া রাম সুগ্রীবের সহিত বন্ধুত্ব স্থাপন করিলেন। এবং বালীকে বধ করিয়া তাহাকে রাজ্য দিবেন বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন। সুগ্রীবও লঙ্কা হইতে সীতার উদ্ধার করিবেন বলিয়া শপথ করিলেন। বালী বড় বলবান্ বানর। তাহাকে মারিয়া ফেলা সহজ নহে। রাম বালীকে বধ করিতে পারিবেন বলিয়া কিছুতেই সুগ্রীবের বিশ্বাস হয় না। এজন্য, রামের বল পরীক্ষার জন্য সে বলিল যদি তুমি এই সাতটী তালগাছ, একবাণের দ্বারা ভেদ করিতে পার, তাহা হইলে আমি বিশ্বাস করিতে পারি যে, তুমি বালীকে বধ করিতে পারিবে। বালীর মত বীর

কেহ কখন দেখে নাই। আমার বোধ হয়, পৃথিবীর সমস্ত বীর একত্রিত হইলেও বালীর সহিত যুদ্ধে পারিয়া উঠিবে না।

রাম বলিলেন বেশ, সুগ্রীব তুমি দেখ! তোমার বিশ্বাসের জন্য আমি এখনই একবাণে এই সাতটী তালগাছ, ভেদ করিয়া দিতেছি। এই বলিয়া রাম ধনুকে বাণ বসাইয়া, খুব জোরে ধনুকে টান দিয়া বাণ ছাড়িলেন। সেই বাণ মহাশব্দে গর্জ্জন করিতে করিতে, সাতটী তালগাছ ভেদ করিয়া চলিয়া গেল। বানরেরা ভাবিত, বালীর মত বীর আর ত্রিভুবনে নাই। কিন্তু এখন রামের বল দেখিয়া সকলে অবাক্ হইয়া রহিল। এবং বুঝিল যে, রাম অনায়াসেই, বালীকে বধ করিতে পারিবেন। সুগ্রীব রাজা হইবে ভাবিয়া সকল বানরই মহা আনন্দিত হইল। তারপর বালী ও সুগ্রীবের যুদ্ধের দিন ঠিক হইল। যুদ্ধে যাইবার সময় সুগ্রীব রামকে বলিয়া গেলেন, দেখিও বন্ধু! আমি তোমার ভরসায় আজ বালীর সহিত যুদ্ধ করিতে যাইতেছি। যাহাতে আমার ও তোমার দুই জনেরই মনের অভিলাষ পূর্ণ হয়, তাহা করিও। আমি তোমাকে প্রতিজ্ঞা করিয়া, বলিতেছি বালী বধ হইলেই যেরূপে পারি, লঙ্কা হইতে তোমার সীতাকে উদ্ধার করিয়া দিব। রাম উত্তর করিলেন বন্ধু! কোন ভাবনা নাই, আমি একবার যাহা স্বীকার করি তাহার অন্যথা হয় না, তুমি নির্ভয়ে বালীর সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও। আমার যাহা কর্ত্তব্য তাহা আমি দূরে গাছের আড়ালে থাকিয়া করিব।

সুগ্রীব রামের বাক্যে আশ্বাস পাইয়া, প্রফুল্লমনে বালীর

সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। প্রথমে গদা যুদ্ধ হইল। দুই জনে প্রকাণ্ড গদা হাতে ঘুরিয়া ঘুরিয়া মহাযুদ্ধ করিতেছে। প্রত্যেক-বারেই সুগ্রীব ভাবিতেছে, এইবার রামের বাণ আসিয়া বালীর বুকে বিঁধিবে। ক্রমে গদাযুদ্ধ ছাড়িয়া ধনুক ও তীর লইয়া যুদ্ধ আরম্ভ হইল। তাহাতেও বালী হটিবার নহে, বরং সুগ্রীব ক্রমে ক্লান্ত ও নিস্তেজ হইয়া আসিতে লাগিল। বহুক্ষণ তীরধনুকে যুদ্ধ হইবার পর, মল্লযুদ্ধ হইল। শেষে হাতাহাতি বাহুযুদ্ধ আরম্ভ হইল। তাহাও প্রায় শেষ হইয়া আসিল, তথাপিও রামের বাণ আসিয়া বালীর বুকে বিঁধিল না।

তখন সুগ্রীব একেবারে হতাশ হইয়া পড়িল। এদিকে রাম ধনুকে তীর জুড়িয়া ছাড়িবার উপক্রম করিতেছেন, এমন সময়ে তিনি এক মহা সংশয়ে পড়িলেন। বালী ও সুগ্রীব দুইজন একই মা বাপের ছেলে, দেখিতেও দুই জনে এক প্রকার। দূর হইতে দুইজনে একস্থানে দাঁড়াইলে, কে সুগ্রীব কে বালী তাহা স্থির করা বড়ই কঠিন। তার পর যুদ্ধে দুই জনে অবিরত ঘুরিতেছে। এজন্য সহজে বালীকে ঠিক করিবার সাধ্য নাই। বালীকে বাণ মারিতে ভুলক্রমে সুগ্রীবকে মারিয়া বসেন, যদি বালীর বদলে সুগ্রীব মারা যায়, বালী মরিলে দুইজনের মনের ইচ্ছা পূর্ণ হয়। কিন্তু সুগ্রীব মরিলে এক দিকে বন্ধু হত্যা-মহাপাপে পড়িতে হয়, অপর দিকে সীতা উদ্ধারের আশা একে-বারে চলিয়া যায়। সুগ্রীব ভিন্ন আর কে সমুদ্র পার হইয়া, লঙ্কা হইতে সীতা উদ্ধার করিবে। এইরূপ উভয় সঙ্কটে পড়িয়া

রাম, একেবারে কাঠের পুতুলের ন্যায় অচলভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন। যে কার্য্যে সন্দেহ হয়, বিজ্ঞ ব্যক্তিরা কদাচ সে কার্য্যে হাত দেন না।

এদিকে সুগ্রীব, বহুক্ষণ ধরিয়া, বালির সহিত যুদ্ধ করিয়া একেবারে দুর্ব্বল হইয়া পড়িল। শেষে প্রাণপর্য্যন্ত, যাইবার উপক্রম হইয়া উঠিল। তখন অন্য কোন উপায় না দেখিয়া, রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করিল। এবং তাহার সকল বিশ্বাস ও সকল আশা ভরসা, মন হইতে একেবারে দূর হইয়া গেল। পুনরায় যখন সে, পাহাড়ে নিজের গৃহে ফিরিয়া আসিল, তখন রামের সহিত তাহার সাক্ষাৎ হইল। তখন সে ঘৃণার সহিত তিরস্কার করিতে করিতে তাহাকে বলিল, বন্ধো! এই বুঝি তোমার বন্ধুত্ব! এই বুঝি তোমার সত্য পালন! এই বুঝি তোমার শরণাগতকে রক্ষা করা! বুঝিতে পারিয়াছি বন্ধু! তুমি এই প্রকারেই লোকের সর্ব্বনাশ করিয়া থাক। আজ বালির সহিত যুদ্ধে আমার, প্রাণ যাইতেছিল, কেবল প্রাণে বাঁচিবার জন্যই পলাইয়া আসিয়াছি। এরূপ বন্ধুর উপর নির্ভর করিয়া, যুদ্ধ করিতে যাওয়া আর নিজে ইচ্ছাপূর্ব্বক প্রাণবিসর্জ্জন দিতে যাওয়া একই কথা। তুমি বীর ও রাজপুত্র, তোমার কথায় বিশ্বাস না করিলে, ত্রিভুবনে কাহার কথায় বিশ্বাস করিব। আমরা বানর জাতি, কিন্তু আমরাও যে কার্য্যের জন্য একবার অঙ্গীকার করি, বা যে কার্য্যে প্রবৃত্ত হই, তাহা শেষ না করিয়া কদাচ ক্ষান্ত হই না।

রামচন্দ্র সুগ্রীবের এই সকল কথা শুনিয়া বলিলেন, বন্ধু

সুগ্রীব! যথেষ্ট হইয়াছে; আর অধিক বলিতে হইবে না। আমার কথাগুলি আগে তুমি শুন, তাহার পর আমার উপর রাগ করিও বা যাহা বলিতে হয় বলিও, আমি দুঃখিত হইব না। তুমি ও বালি, যখন যুদ্ধ আরম্ভ করিলে, তখন দূর হইতে কে সুগ্রীব ও কে বালি তাহা আমি স্থির করিতে পারিলাম না। বিশেষতঃ তোমরা দুইজনে যুদ্ধ করিবার সময় অনবরত ঘুরিতেছিলে, কে কোন্ সময় কোন্ দিকে যাও, তাহা ঠিক করা আমার পক্ষে বড়ই কঠিন হইয়াছিল। পাছে বালিকে বাণ মারিতে তোমার গায়ে লাগে, এই ভয়ে আমি তীর ছুড়িতে পারি নাই। আমার এই সকল কথা তুমি বেশ করিয়া বুঝিয়া বল দেখি, আমি এই সন্দেহের মধ্যে থাকিয়া কিরূপে বাণ মারিতে পারি? আমার সীতার উদ্ধার না হয় তাহাও ভাল, তথাপি আমি তোমার ন্যায় বন্ধুকে, মারিয়া ফেলিতে পারিব না। আর তোমাকে মারিয়া আমি নিজেও বাঁচিতে পারিব না। যে বিপদে পড়িয়া এবার বালিকে মারিতে পারি নাই, তাহা এক্ষণে শুনিলে ত। এক্ষণে আমার পরামর্শ শুন, আর একবার তুমি বালির সহিত যুদ্ধে যাও। আমাকে বিশ্বাস কর। এবার তুমি একটী ফুলের মালা গলায় দিয়া যাইবে, আমি ফুলের মালা দেখিয়া তোমাকে চিনিতে পারিব, এবং নিঃসন্দেহে বালিকে মারিতে পারিব। আমি তোমাকে অনুরোধ করিতেছি, এইবার তুমি আমার সত্য পালন পরীক্ষা কর। বন্ধো! যদি আমি সেই সময় বাণ মারিতাম, তাহা হইলে ত তোমার প্রাণনাশ হইতে পারিত।

এই জন্যই আমি বাণ নিক্ষেপে নিরস্ত ছিলাম। আর সেই জন্যই তুমি আমাকে, এই প্রকার অবিশ্বাস করিতেছ। যাহা হউক, আর একবার তোমাকে যুদ্ধে যাইবার জন্য অনুরোধ করিতেছি। এইবার তুমি দেখিতে পাইবে, রাম সত্যবাদী কি মিথ্যাবাদী। এইবার তুমি জানিতে পারিবে, রাম ধনুক ছাড়িতে জানে কি না।

সুগ্রীব রামের এই সকল যুক্তিপূর্ণ কথা শুনিয়া তাঁহার উপর রাগ ও অবিশ্বাস করিলেও, এখন সন্তুষ্ট হইল। এবং বলিল, বন্ধু! তোমার সকল কথাই আমি বুঝিলাম। আচ্ছা, তোমার কথায় আর একবার বিশ্বাস করিয়া, বালির সহিত যুদ্ধে যাইব। আমার ভাগ্যে যাহা থাকে তাহাই হইবে; এইবার তোমার কথামত ফুলের মালা গলায় পরিয়া যুদ্ধে যাইব। কএক দিন পরে পুনরায় সুগ্রীব বালির সহিত যুদ্ধের দিন স্থির করিল। বালীও সুগ্রীবের সহিত বার বার যুদ্ধে জিতিয়া, মনে বড়ই অহঙ্কার হইয়াছিল। সুগ্রীবকে আর সে বীর বলিয়া জ্ঞান করিত না। সুগ্রীব আবার তাহার সহিত যুদ্ধ করিবে শুনিয়া সে হাসিয়া অস্থির হইল, এবং নিতান্ত তাচ্ছিল্যের সহিত, আবার যুদ্ধের দিন স্থির করিয়া দিল। এবার সুগ্রীব এক ছড়া বড় ফুলের মালা গলায় পরিয়া যুদ্ধে আসিয়াছিল। সুতরাং বালি ও সুগ্রীবকে চিনিয়া লইতে রামের আর কোন কষ্ট হইল না। দূর হইতে গলায় ফুলের মালা দেখিয়াই বন্ধুকে চিনিয়া লইতে পারিলেন। তৎপরে তাহাদের যুদ্ধ আরম্ভ হইলে, রাম দূর হইতে গুপ্তভাবে থাকিয়া ধনুকে তীর জুড়িলেন এবং বালিকে লক্ষ্য করিয়া, জোরে তীর ছাড়িলেন। রামের তীর

ধনুক হইতে বাহির হইয়া, বাতাস ভেদ করিয়া মহাশব্দে চারি দিক্ তোলপাড় করিয়া গিয়া, বালির বুকে যাইয়া বিঁধিল। বালী সেই বাণের আঘাতে সহ্য করিতে না পারিয়া বাপ্‌রে, বাপ্‌রে কি ভয়ানক বাণের আঘাত! ম'লাম,ম'লাম করিয়া অস্থির হইল, তখন সুগ্রীব মহা আনন্দে ও খুব জোরে ধাক্কা দিয়া ভূমির উপর ফেলিয়া দিল। বালি রামের বাণের আঘাতে, তখনই মরিল না

রাম কর্ত্তৃক বালী বধ।

বটে, কিন্তু তাহার আর উঠিবার শক্তি রহিল না। এবং ক্রমেই দুর্ব্বল হইয়া সে অন্তিম সময়ে উপস্থিত হইল। তখন রাম, তাহার অন্তিম কাল জানিয়া, তাহাকে উদ্ধার করিবার জন্য, বালির সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। রাম দেবতা, তাঁহার হাতে যে মরে সে একেবারে স্বর্গে যায়, এজন্য হিন্দুগণ মরিবার সময় সকলকেই রাম নাম শুনাইয়া থাকে।

বালী সম্মুখে রামকে দেখিয়া বলিলেন, আমি বুঝিয়াছি,

সুগ্রীবের সাধ্য নাই যে আমাকে বধ করে, তুমিই আমার মৃত্যুর কারণ হইয়া সুগ্রীবের সহায় হইলে, ও বিনাদোষে আমার প্রাণ সংহার করিলে। আমি ত জ্ঞানে তোমার কখনও কোন অপকার করি নাই, তবে কি জন্য আমাকে প্রাণে মারিলে। রাম! তুমি দেবতা, তোমার হাতে মরিলাম তাহাতে আমার দুঃখ নাই, তুমি আমার প্রাণবধ করিলে ইহাতে বরং আমার স্বর্গে গতি হইল, ইহাও গৌরবের বিষয়। আমার বালক পুত্র অঙ্গদ ও রাজ্যস্থ সকল বানরই, আজ হইতে তোমার শরণাগত হইল, তুমি ইহাদিগকে রক্ষা করিও। এইরূপ বলিয়া সকলের সম্মুখে, বালী মরিয়া গেল। এদিকে বালির স্ত্রী তারা পতি-বিয়োগে অস্থির হইয়া, উন্মাদিনীর মত ছুটিয়া সেইস্থানে আসিয়া উপস্থিত হইল। এবং রামচন্দ্রের দিকে তাকাইয়া বলিতে লাগিল, হে পূর্ণব্রহ্ম! এই কি দেবতার ন্যায় কাজ হইল? তুমি না দেবতা? যাহা হউক, যাহা করিয়াছ তোমার পক্ষে ভালই হইয়াছে। কিন্তু আমি স্ত্রীলোক, আমার এমন ক্ষমতা নাই যে তোমার সহিত যুদ্ধ করি। কিন্তু ইহা নিশ্চয় জানিও যে, যদি আমার পতিপদে মতি থাকে, যদি আমি সতী হই, যদি তুমি অন্যায় ভাবে আমার পতিকে বধ করিয়া থাক, তাহা হইলে আমি তোমাকে এই অভিসম্পাত করিতেছি যে, তুমি স্বয়ং পূর্ণ-ব্রহ্ম অবতার হইলেও সময়ে সময়ে তাহা ভুলিয়া যাইবে।

সুন্দরকাণ্ড ।

বালির মৃত্যুতে সুগ্রীব বড়ই আনন্দিত হইল। কিষ্কিন্ধ্যার রাজা হইবার আর তাহার কোন বাধা রহিল না। বালির রাজত্বে যত বানর ছিল, সকলেই সুগ্রীবের আশ্রয় গ্রহণ করিল এবং সুগ্রীব রামের নিকট যে সত্য করিয়াছিল, তাহা পালন করিবার জন্য হনুমান্, জাম্বুবান্, নল, নীল ও অঙ্গদ প্রভৃতি অনেক বলবান্ বানর সংগ্রহ করিয়া লঙ্কার দিকে যাত্রা করিল। প্রথমে একবার লঙ্কায় সীতাকে দেখিয়া আসিতে হইবে, কিন্তু সেই মহা সমুদ্র পার হইয়া, কিরূপে লঙ্কায় যাইবে, ইহাই সকলের এক বিষম ভাবনার বিষয় হইয়া উঠিল। অবশেষে হনুমান্ যাইতে স্বীকার করিল, এবং রামের পদধূলি লইয়া লঙ্কায় যাত্রা করিল। রাম সীতার বিশ্বাসের জন্য হনুমানের নিকট তাঁহার হাতের আংটী খুলিয়া দিলেন এবং বলিয়া দিলেন সীতাকে এই আংটী দেখাইলেই বুঝিতে পারিবেন যে তুমি রামের চর। হনুমান্ তখন আনন্দে জয়রাম শ্রীরাম শব্দ করিতে করিতে লম্ফ দিয়া চলিল। সমুদ্রের মধ্যে সুরসা নামে একটা রাক্ষসী বাস করিত। হনুমানকে দেখিয়া সে মহানন্দে আকাশ পাতাল হা করিয়া গিলিতে গেল। হনুমান্ জয়রাম বলিয়া সমুদ্রের মধ্যে সেই রাক্ষসীকে নিপাত করিল এবং সমুদ্র পার হইয়া

লঙ্কায় যাইয়া উপস্থিত হইল এবং রাবণের রাজ্য দেখিয়া অবাক্ হইয়া গেল। এই প্রকাণ্ড লঙ্কার মধ্যে সীতা কোথায়

সুরসা রাক্ষসীর আকাশ পাতাল হাঁ।

আছেন, খোঁজ করিতে হইবে, হনুমানের পক্ষে ইহাও একটা ভাবনার কথা হইল।

হনুমান্ প্রথমে স্থির করিল সীতা রাবণের অন্তঃপুরের মধ্যেই আছেন। তখন হনুমান্ রাক্ষসীর রূপ ধরিয়া রাবণের বাড়ীর ভিতরে প্রবেশ করিল। তথায় ঢুকিয়া গৃহে গৃহে দেখিতে লাগিল কিন্তু সেখানে সেরূপ পতিহারা, দুঃখে কাতরা কোন স্ত্রীলোক দেখিতে পাইল না। সকলেই মনের আনন্দে কাজ করিতেছে। যে যাহার মত আহার করিতেছে। কেহ বা ঘুমাইতেছে, মনে যেন কাহারও কোন দুঃখ নাই। হনুমান্ ভাবিল ইহার মধ্যে মা সীতার খোঁজ করিয়া বাহির করা সহজ কথা নহে। যাহা হউক

রামের পাদপদ্ম চিন্তা করিয়া, যে কাজ করিতে আসিয়াছি, তাহা কোনরূপে সিদ্ধ করিয়া যাইতেই হইবে।

কিছুক্ষণ এই ভাবে ঘুরিয়া ঘুরিয়া, হনুমান্ একটী স্থানে বসিল। রাবণের বাড়ীর মধ্যে অসংখ্য রাক্ষসী আছে। কে কাহার খোঁজ রাখে। অনেকে অনেককে চিনিতেও পারে না। সুতরাং এ নূতন রাক্ষসীর খোঁজ কেহই লইল না। সকলেই ভাবিল আমাদের মত এ রাক্ষসীও এক জন চাকরাণী। তাহাকে দেখিয়া কেহ কোনরূপ ভয় বা সঙ্কোচ করিল না, সকলেই যে যাহার ইচ্ছা মত কথাবার্ত্তা বা পরামর্শ করিতে লাগিল। রাবণ সীতাকে চুরি করিয়া লইয়া যাইবার পর হইতে, তাহাদের মধ্যে সীতার সম্বন্ধে নানারূপ গল্প ইত্যাদি ও কথাবার্ত্তার একটা প্রধান বিষয় হইয়া উঠিয়াছে। কেহ সীতার প্রশংসা করিতেছে, কেহ বা নিন্দা করিতেছে, কেহ তাহার রূপের প্রশংসা করিয়া বলিতেছে, মেয়েটী ঠিক দেবতা, দেখিলেই মনে ভক্তি ও ভালবাসার উদয় হয়।

হনুমান্ রাক্ষসীদিগের এই প্রকার কথাবার্ত্তা হইতে ক্রমে বুঝিয়া লইল যে, সীতা অশোক বনে রহিয়াছেন ও অনেক চেড়ী অর্থাৎ মেয়ে রাক্ষসী তাহাকে পাহারা দিতেছে। হনুমান্ রামনাম স্মরণ করিয়া অশোক বনের উদ্দেশে যাত্রা করিল এবং সামান্য একটী মর্কটের রূপ ধারণ করিয়া, অশোক বনের গাছে গাছে ও ডালে ডালে থাকিয়া সীতার খোঁজে ঘুরিতে লাগিল। কতক্ষণ পরে দেখিতে পাইল, একদল চেড়ী একটী মেয়েকে

ঘিরিয়া কত বুঝাইতেছে, রাবণের শত শত প্রশংসা করিতেছে এবং আর যে পুনরায় রামকে পাওয়া যাইবে না,এবং এই বিশাল সমুদ্রপার হইয়া লঙ্কায় কোন মনুষ্যের আসিবার সাধ্য নাই। এইরূপ বার বার তাহাকে বুঝাইতেছে। যতই তাহারা তাহাকে বুঝাইতেছে, সে মেয়েটী ততই কাঁদিতেছে; কাঁদিয়া কাঁদিয়া তাহার চোক জবাফুলের মত লাল হইয়াছে। ধূলায় পড়িয়া থাকাতে মাথার চুলে জটা বাঁধিয়াছে। শরীরের উপর কোন যত্ন নাই, আহার নিদ্রা নাই। একেবারে অনাথা ও চির দুঃখিনীর মত পড়িয়া আছে। হনুমান্ দেখিয়াই বুঝিতে পারিল যে, এই তাহার রামের সীতা। ইঁহাকেই দুষ্ট রাবণ, পঞ্চবটী বন হইতে চুরী করিয়া আনিয়াছে। সীতাকে রামের সংবাদ দিবার জন্য, হনুমান্ তখন বড় ব্যস্ত হইল। কিন্তু রাক্ষসীরা তথায় উপস্থিত থাকাতে, সেখানে যাওয়া ভাল নহে মনে করিয়া কখন রাক্ষসীরা সীতাকে ছাড়িয়া চলিয়া যাইবে এই অপেক্ষায় গাছের পাতার আড়ালে সে লুকাইয়া রহিল।

কিছুক্ষণ পরে, রাক্ষসীরা সীতাকে রাখিয়া, ক্রমে ক্রমে সকলেই চলিয়া গেল। তাহারা সীতার পাহারায় নিযুক্ত থাকিলেও সীতার অবস্থা দেখিয়া, আর তাহাকে ভয় করিবার কোন কারণ নাই ভাবিয়া তাহারা নিশ্চিন্ত মনে নিজ নিজ কাজে চলিয়া গেল। তাহারা ইহা বেশ জানিত যে, এই রাক্ষসের রাজ্যে যাহার চারি দিকেই রাক্ষসেরা পাহারা দিতেছে, তাহার মধ্যে ফাঁকি দিয়া সীতা কোথায় পলাইবে। বিশেষ লঙ্কার চারি

দিকেই ভয়ানক সমুদ্র, এই সমুদ্রই লঙ্কার লোকদিগকে আটকাইয়া রাখিতেছে। এই সব বিবেচনা করিয়া রাক্ষসীরা আর সীতার পলাইবার আশঙ্কা করিল না, এবং সীতাকে রাখিয়া আপন মনে যথা ইচ্ছা চলিয়া গেল। সীতাও সেইখানে মরার ন্যায় পড়িয়া রহিলেন।

হনুমান্, এই সুযোগ পাইয়া, ক্রমে ক্রমে গাছ হইতে নামিয়া নিজ মূর্ত্তি ধারণ করিল, এবং সীতার নিকট আসিয়া প্রণাম

হনুমান্ সীতাকে আংটী দেখাইতেছে।

করিল। সীতা হনুমান্‌কে দেখিয়া, প্রথমে বড় ভয় পাইলেন। তখন হনুমান্ বলিল, মা, ভয় নাই। আমি রামের দাস, আমার

নাম হনুমান্। পঞ্চবটী বন হইতে,রামের সংবাদ লইয়া, আপনার নিকট আসিয়াছি। এই দেখুন, প্রভু রামচন্দ্র আপনার বিশ্বাসের জন্য, তাঁহার হাতের আংটী আমার নিকট দিয়াছেন। এই বলিয়া হনুমান্ রামের আংটীটি সীতাকে দিল। হনুমানের কথায় প্রথমে সীতার বিশ্বাস হয় নাই; কারণ লঙ্কা রাক্ষসের পুরী। রাক্ষসেরা বড় মায়া জানে, তাঁহাকে ভুলাইবার জন্য তাহারা, কত প্রকার মায়া করিতেছে। কিন্তু রামের হাতের আংটী, দেখিয়া হনুমানের কথায় সীতার বিশ্বাস হইল। তখন তিনি বড়ই আনন্দিত হইলেন। তৎপরে হনুমানের নিকট রাম ও লক্ষ্মণের সংবাদ পাইয়া,সেই দুঃখের মধ্যেও সীতা অনেক সুখী হইলেন। হনুমান্ বলিল, মা! আপনার কোন ভয় নাই। আমরা অনেক বানর প্রভুর সহিত জুটিয়াছি, এইবার প্রভু রামচন্দ্র ও লক্ষ্মণ ঠাকুরকে লইয়া, আমরা সকলে লঙ্কায় আসিব, এবং রাবণকে উপযুক্ত শাস্তি দিয়া, আপনাকে এই পাপ লঙ্কা হইতে উদ্ধার করিব। রাবণ যেমন পাপী, এইবার তাহার সকল পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইবে। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, আর অধিকক্ষণ আমি এস্থানে থাকিতে পারিব না। অনুমতি করুন, আমি প্রভুকে আপনার সংবাদ জানাই।

সীতার নিকট হইতে বিদায় হইবার সময়, সীতা হনুমানের হাতে তাঁহার মাথার একটী মাণিক খুলিয়া দিয়া বলিলেন, সীতানাথকে বলিও, যত সত্বর পারেন লঙ্কায় আসিয়া আমাকে উদ্ধার করেন। এই কথা বলিয়া সীতা কএকটী পাকা আম

হনুমানের হাতে দিলেন। আমের আর একটী নাম অমৃত ফল। হনুমান আম খাইয়া দেখিল যে এরূপ ফল সে আর কখনও খায় নাই। বানর জাতি ফল মূল ও পাতা খাইয়াই জীবন ধারণ করে বটে, কিন্তু এরূপ সুমিষ্ট ফল সে কখনও দেখে নাই। হনুমান্ তখন মনে মনে ভাবিল, দুই এক দিন লঙ্কায় থাকিয়া, এই ফল পেট পূরিয়া খাইতে হইবে এবং আমি যে রামের চর এখানে আসিয়াছি, রাবণ রাজাকে তাহারও কিছু কিছু পরিচয় দিয়া যাইতে হইবে।

এই স্থির করিয়া, হনুমান্ তখন সীতার নিকট হইতে আমের বাগান কোথায় আছে তাহা জানিয়া লইল। এবং মনের আনন্দে জয় রাম, শ্রীরাম শব্দ করিয়া, এক ধার হইতে অশোক-বন ভাঙ্গিতে আরম্ভ করিল। তৎপরে আমের বাগানে ঢুকিয়া, আম খাইয়া, বাগান ভাঙ্গিয়া, একাকার করিয়া ফেলিল। রাবণের চাকরবাকর ও মালি প্রভৃতি সকলে প্রথমে একটা বানর দেখিয়া, তাহাকে তাড়াইয়া দিবার চেষ্টা করিল। কিন্তু হনুমান সাধারণ বানর নয়। যতই তাহারা তাহাকে তাড়া করে, ততই সে বড় বড় গাছ ভাঙ্গিতে আরম্ভ করে। রাক্ষসেরা বেগতিক দেখিয়া, রাবণের নিকট জানাইল যে একটী প্রকাণ্ড বানর আসিয়া অশোকবন, ও আম বাগান সমস্ত নষ্ট করিতেছে। আমগুলিত প্রায় সব খাইয়া ফেলিয়াছে, তারপর গাছগুলিও ভাঙ্গিয়া ফেলিতেছে। তাড়া দিলে আরও রাগিয়া জয় রাম, শ্রীরাম বলিয়া, লাফ দিয়া বড় বড় গাছ ভাঙ্গিতে

আরম্ভ করে। তাহাকে তাড়াইয়া দিতে বা ধরিতে কাহারও সাধ্য হইতেছে না।

হনুমান রামের চর, ইহা বুঝিতে পারিয়া, রাবণ রাগে জ্বলিয়া উঠিল! এবং লঙ্কার সমস্ত পাহারাওয়ালা ও বড় বড় রাক্ষস-দিগকে ডাকিয়া হুকুম দিল যে, তোমরা সকলে অতি সত্বর সেই বানরটাকে বাঁধিয়া আমার কাছে আন, আমি এখনই তাহার সমুচিত শাস্তি দিব। রাবণের আজ্ঞায়, তখনই সকলে চারি দিকে ছুটিল, এবং হনুমান্‌কে ধরিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। হনুমান্ ভাবিল ইহারা আমাকে ধরিতে আসিয়াছে,কিন্তু সহজে ইহাদিগকে ধরা দেওয়া হইবে না। ইহাদিগকে লইয়া একটু মজা করা যাউক। রাক্ষসেরা হনুমান্‌কে ধরিবার জন্য যখন তাহার নিকটে যায়, তখন হনুমান্ ছোটটী হইয়া এক লাফে, এক গাছ হইতে আর এক গাছের আগায় গিয়া বসে। তখন রাক্ষসেরা

রাবণের সভায় হাত পা বাঁধা হনুমান।

সে গাছ হইতে নামিয়া ঐ গাছে উঠে। এইরূপে এগাছ ওগাছ, এক ঘরের ছাদ হইতে আর এক ঘরের ছাদে, এক প্রাচীর হইতে, আর এক প্রাচীরে, বেড়াইয়া বেড়াইয়া রাক্ষসগুলিকে, একেবারে আদমরা করিল। শেষে একটা প্রকাণ্ড শরীর ধরিয়া, একঘরের ছাদের উপর শুইয়া পড়িল, রাক্ষসেরা তখন তাহাকে ধরিল, ও দড়া দড়ি আনিয়া বাঁধিল। কিন্তু হনুমান্ এত ভারী হইয়াছে যে, কেহ তাহাকে তুলিতে পারিল না। দশ বারটী রাক্ষসে হনুমানের লেজটীও নাড়িতে পারিল না। তখন সকলে হতাশ হইয়া বসিয়া পড়িল। শেষে হনুমান্ একটু হাল্‌কা হইল তখন সকলে বাঁশ ও দড়া দড়ি দিয়া বাঁধিয়া, কোনরূপে ঘাড়ে করিয়া, তাহাকে রাবণের সভায় লইয়া গেল।

রাবণ হনুমান্‌কে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তুই কে?" হনুমান্ উত্তর করিল "আমার নাম হনুমান্, আমি রামের দাস।" রাবণ জিজ্ঞাসা করিল, "তুই এখানে কেন আসিয়াছিস্"? হনুমান্ বলিল, তুমি সীতাকে চুরি করিয়া আনিয়াছ, তাহার সংবাদ পাইয়া সীতাকে দেখিতে আসিয়াছি। যদি ভাল চাও এখনও সীতাকে লইয়া রামকে দাও। নচেৎ তোমার রক্ষা নাই। রাম আসিয়া তোমাকে সবংশে মারিয়া সীতা লইয়া যাইবেন।

হনুমানের এই কথা শুনিয়া রাবণ বড় রাগিয়া উঠিল, এবং প্রহরীগণকে হুকুম দিল, ইহাকে মার। কিন্তু রাবণের ভ্রাতা বিভীষণ বলিলেন, এ দুত, দুতকে প্রহার করা রাজার ধর্ম্ম

নহে! ইহাকে অন্য শাস্তি দাও। ইহার লেজ পোড়াইয়া দাও। এই কথায় রাক্ষসেরা, বোঝায় বোঝায় কাপড় আনিয়া, হনুমানের লেজে জড়াইতে লাগিল; শেষে ইহা তৈলে ভিজাইয়া, তাহাতে আগুন ধরাইয়া দিল! এবং হনুমানের গলায় দড়ি দিয়া লঙ্কার রাস্তায় রাস্তায় ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। যখন লেজের আগুন বড় বাড়িয়া উঠিল, তখন হনুমান্ অস্থির হইয়া জয় রাম, শ্রীরাম শব্দে বন্ধন ছিঁড়িয়া ফেলিল। তার পর সেই আগুন ধরান লেজ ঘুরাইয়া রাক্ষসদিগকে মারিতে লাগিল। রাক্ষসেরা বাপ্‌রে আগুনে পুড়িয়া ম'লাম্‌রে, বলিয়া চীৎকার করিতে করিতে ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িল। হনুমান্ জ্বলন্ত লেজ লইয়া, লঙ্কার প্রতি ঘরের চালে আগুন লাগাইয়া ঘুরিতে লাগিল। লঙ্কায় তখন

হনুমানের পলায়ন।

বিষম অগ্নিকাণ্ড উপস্থিত হইল। একেবারে এক সময়

লঙ্কার সকল ঘর জ্বলিয়া উঠিল, কাহার সাধ্য আগুনের তাপে লঙ্কায় থাকে। প্রাণরক্ষার জন্য সকলে বাড়ী ঘর ছাড়িয়া সমুদ্রের জলে পড়িল। তথাপি হনুমান ছাড়িবার নয়, সেই জ্বলন্ত লেজের বাড়ী তাহাদের মুখের উপর মারিতে লাগিল। এই প্রকারে অসংখ্য রাক্ষস মারিয়া, লঙ্কা পোড়াইয়া, হনুমান্ সমুদ্রের জলে লেজের আগুন নিবাইল। এবং সমুদ্র পার হইয়া রামের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইল।

হনুমান লঙ্কা হইতে ফিরিয়া আসিয়াছে, এই সংবাদে সকলে আসিয়া একত্র হইল। রাম লক্ষ্মণ ও অন্যান্য বানরগণ সীতার সংবাদ শুনিলেন। এবং কিরূপে সাগর পার হইয়া লঙ্কায় যাইয়া সীতার উদ্ধার করিবেন; তখন এই কথা সকলে ভাবিতে লাগিলেন।

লঙ্কাকাণ্ড।

লঙ্কার সেই রকম দুরবস্থা করিয়া, হনুমান্ চলিয়া আসিলে, সকল রাক্ষসই তাহার বিক্রম দেখিয়া, ভয় পাইয়াছিল। তারপর হনুমানের হাতে তাহাদের দুর্দ্দশার কথা একে একে আসিয়া রাবণকে জানাইতে লাগিল। কেহ কেহ বলিল, হনুমানের যে বল বিক্রম তাহাতে তাহার সহিত পারিয়া উঠা যাইবে না। তার পর রাম আসিলে, তাহার সহিতও কেহ পারিবে, এরূপ বোধ হয় না। বিভীষণ রাবণকে বলিলেন, দাদা! রাম দেবতা, তাঁহার সীতা চুরী করিয়া, সর্ব্বনাশের সূত্রপাত করা হইয়াছে। এখনও সীতাকে ফিরাইয়া দিয়া রামের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর। নচেৎ লঙ্কার সর্ব্বনাশ হইবে। লঙ্কায় এমন কোন বীর নাই যে রামের সহিত যুদ্ধে ক্ষণমাত্রও দাঁড়াইবে। হনুমান্ একটা সামান্য বানর, তাহার বিক্রম দেখিলে? সে একাকী লঙ্কার কি দুর্দ্দশা করিয়াছে, একবার ভাবিয়া দেখ! ইহার পর শত শত বানর লইয়া, রাম আসিলে আর লঙ্কার চিহ্নও থাকিবে না, অতএব দাদা! এখনও চারিদিক্ যাহাতে রক্ষা হয়, তাহার উপায় কর।

বিভীষণের কথা রাবণের সহ্য হইল না। রাবণ বিভীষণকে গালাগালি দিয়া, অপমান করিয়া, লঙ্কা হইতে তাড়াইয়া দিল।

বিভীষণ দুই একজন রাক্ষস সঙ্গে লইয়া সমুদ্র পার হইয়া রামের নিকট চলিয়া আসিলেন। এবং রামের সহিত মিত্রতা করিলেন। বিভীষণের মন্ত্রণায়, সীতা উদ্ধারের পথ অনেক সহজ হইল।

বানরগণের মধ্যে নল একজন ভাল ইঞ্জিনীয়ার ছিল। সে কতকগুলি বানরকে সঙ্গে করিয়া, নিকটস্থ পাহাড় হইতে পাথর কাটিয়া আনিতে আরম্ভ করিল। এবং কিছুদিন পরে সমুদ্রের উপর দিয়া এক অতি সুন্দর প্রস্তরময় সেতু প্রস্তুত করিয়া ফেলিল। তৎপরে রাম ও লক্ষ্মণ বানরের দল লইয়া বিভীষণের সহিত সাগর পার হইয়া, লঙ্কায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। রাম লঙ্কায় আসিয়াছেন শুনিয়া, রাক্ষসেরা যুদ্ধের উদ্যোগ করিল। প্রথমে রাবণের নিকট, অনেক বৃদ্ধ রাক্ষস আসিয়া, রামকে সীতা ফিরাইয়া দিবার জন্য বলিল। কিন্তু রাবণ বড় পাপী, সৎপরামর্শ তাহার ভাল লাগিল না। কিছুতেই তাহাদের সেই কথায় স্বীকৃত হইল না। বানরেরা লঙ্কায় আসিয়াই নানারূপ উৎপাত আরম্ভ করিল। একদিন অঙ্গদ রাবণের সভায় যাইয়া, রাবণকে বিলক্ষণ শাস্তি দিল। এক লাফে তাহার মাথায় উঠিল, এবং সিংহাসন হইতে রাবণকে ফেলিয়া দিয়া নিজেই তাহার সিংহাসনে বসিল। এই প্রকার দুই চারি দিন উৎপাত করিবার পরই যুদ্ধ বাঁধিয়া উঠিল।

প্রথমে রাবণের বড় বড় বীর সকল যুদ্ধ করিতে আসিল। তাহাদের সঙ্গে দলে দলে, হাজার হাজার রাক্ষস, অস্ত্রশস্ত্র লইয়া মার মার শব্দে আসিতে লাগিল। এদিকে হনুমান্, জাম্বুবান্,

নল, নীল, অঙ্গদ, সুগ্রীব, গয়, গবাক্ষ প্রভৃতি বানরেরাও জয় রাম শ্রীরাম শব্দে তাহাদের উপর আসিয়া পড়িল। তখন চারিদিকে কেবল যুদ্ধ চলিতে লাগিল। কেহ ধনুক তীর লইয়া, কেহ বা গদা লইয়া, কেহ বা ঢাল তলোয়ার লইয়া যুদ্ধ করিতে লাগিল। যে যাহাকে সাম্‌নে পায়, অমনি তাহাকে মারিতে লাগিল। রাক্ষসেরা বড় মায়া জানে। তাহারা নানারকম মায়া করিয়া, এখানে সেখানে বানরদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিল। বানরেরাও এক একটা রাক্ষসকে, এক এক চড়ে একেবারে মাটীতে ফেলিতে লাগিল। কামড়াইয়া কাহারও নাককান ছিঁড়িয়া দিল। কাহারও বা নখ দিয়া পেট চিরিয়া ফেলিল। রাক্ষসের বাণ খাইয়া বানরেরা সময়ে সময়ে অজ্ঞান হইয়া পড়িতে লাগিল বটে, কিন্তু আবার কিছুক্ষণ পরেই জ্ঞান পাইয়া একেবারে দুনো বলে রাক্ষস মারিতে লাগিল। এইরূপে যুদ্ধ চলিতে লাগিল। উভয় পক্ষেরই এত প্রাণী মরিতে লাগিল যে, তাহা গণিয়া উঠে কাহার সাধ্য। পরিশেষে রাক্ষসেরা একে একে সব মরিয়া গেল।

বড় বড় রাক্ষস মরিয়া গেল দেখিয়া, রাবণ তাহার পুত্র ইন্দ্রজিৎকে যুদ্ধে পাঠাইলেন। ইন্দ্রজিৎ খুব যুদ্ধ করিতে জানে। সে মেঘের আড়ালে থাকিয়া যুদ্ধ করে। সে কাহাকেও ভয় করে না। এমন কি দেবরাজ ইন্দ্রকেও সে যুদ্ধে হারাইয়া দিয়াছে। ইন্দ্র, চন্দ্র সকলেই তাহাকে ভয় করেন। ইন্দ্রজিৎ অনেক রাক্ষস-সেনা লইয়া যুদ্ধে আসিল। এবং রাম লক্ষ্মণের

সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করিল। তার পর সে বুঝিল রাম লক্ষ্মণ নিতান্ত সহজ বীর নয়। ইন্দ্রের সহিত অনায়াসে যুদ্ধ করিয়াছে, কিন্তু রাম লক্ষ্মণের সহিত যুদ্ধ করিতে করিতে প্রাণ যায় যায় হইয়াছে। আর উপায় নাই দেখিয়া ইন্দ্রজিৎ রাক্ষসের মায়া করিয়া নাগপাশ অস্ত্র মারিয়া, একেবারে রামলক্ষ্মণকে সাপ দিয়া বাঁধিয়া ফেলিল। সাপের বন্ধনে পড়িয়া রাম লক্ষ্মণের আর যুদ্ধ করিবার ক্ষমতা রহিল না। সাপের বিষে

রাম লক্ষ্মণ নাগপাশে বদ্ধ।

লক্ষ্মণ একেবারে অজ্ঞান হইয়া পড়িলেন। হনুমান্ ও আর আর বানরেরা, ধরাধরি করিয়া তাঁহাদিগকে শিবিরে লইয়া আসিল। রাম ও লক্ষ্মণের এই প্রকার অবস্থা দেখিয়া, সকলেই হতাশ হইয়া পড়িল। বিভীষণের বুদ্ধিতে সকলে মিলিয়া গরুড়কে

স্মরণ করিতে লাগিল। গরুড়ের নাম শুনিয়া, অনেক সাপ পলাইতে আরম্ভ করিল, তার পর চারিদিক্ অন্ধকার করিয়া, মহাশব্দে গরুড় আসিয়া উপস্থিত হইল। গরুড় সাপ খাইতে বড়ই ভালবাসে। সাপ দেখিলেই খাইয়া ফেলে। এজন্য সাপ পাইলে গরুড়ের আনন্দের সীমা থাকে না, গরুড় আসিয়াই কতকগুলি সাপকে ধরিয়া, আস্ত গিলিয়া ফেলিল। বাকী সাপগুলি তাহাকে দেখিয়াই পলাইয়া গেল। বানরদিগের ও বিভাষণের সেবার একটু পরেই রাম ও লক্ষ্মণের জ্ঞান হইল। তখন তাঁহারা সকলে একত্র মিলিয়া, ইন্দ্রজিৎকে মারিবার উপায় স্থির করিতে লাগিলেন।

বিভীষণ রাবণের ভাই, চিরকাল লঙ্কায় ছিলেন। রাবণ অপমান করিয়াছে বলিয়াই, তাহাকে ছাড়িয়া রামের নিকট আসিয়াছেন। এবং তাঁহার সহিত বন্ধুত্ব করিয়াছেন, প্রাণপণে রামের সাহায্য ও উপকার করিবেন বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, আজ এই বিপদে পড়িয়া রাম বলিলেন, বন্ধু! এই লঙ্কায় তুমিই আমার একমাত্র বল ও ভরসা। তোমার পরামর্শ ভিন্ন আমি কিছুতেই এই সকল বলবান্ রাক্ষস মারিয়া, সীতার উদ্ধার করিতে পারিব না। কেবল মাত্র তোমার ভরসাতেই আমি এ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছি। রাক্ষসেরা বড় মায়া জানে, তাহাদিগকে পরাজয় করা বড়ই কঠিন ব্যাপার।

সকলে সুস্থির হইলে রাম, লক্ষ্মণ ও বিভীষণ একত্র মিলিয়া ইন্দ্রজিৎ বধের পরামর্শ করিতে লাগিলেন। ইন্দ্রজিৎকে মারিতে

না পারিলে আর কোনও ভরসা নাই। কেহই ইন্দ্রজিতের মত যুদ্ধ করিতে পারে না। যে তাহার সহিত যুদ্ধ করিতে যায়, সেই হারি মানিয়া ফিরিয়া আইসে। যে ফিরিয়া না আইসে, সে একেবারে যমের বাড়ী যায়।

বিভীষণ লঙ্কার সকল খবরই জানেন। যেখানে বিপদ উপস্থিত হয়, সেই খানেই বিভীষণের মন্ত্রণায় উদ্ধার হয়। রাম, বিভীষণকে বন্ধু পাইয়া, রাক্ষস মারিয়া রাবণ-বধ করিয়া পুনরায় সীতাকে পাইবেন মনে মনে আশা করিয়াছেন। বিভীষণ বলিলেন—লঙ্কায় ইন্দ্রজিতের মত বীর আর নাই। দেবতার রাজা ইন্দ্রকে যুদ্ধে হারাইয়া ইন্দ্রজিৎ নাম পাইয়াছে। ইন্দ্রজিৎ মেঘের আড়ালে থাকিয়া যুদ্ধ করিতে পারে। তাহার ভয়ে দেবতারাও কম্পিত। কেহ তাহার শত্রু হইতে সাহস করে না। ইন্দ্রজিৎকে মারিবার একমাত্র উপায় আছে। সাম্‌না সাম্‌নি যুদ্ধ করিয়া কেহ তাহাকে মারিতে পারিবে না। গোপনে গুপ্তস্থানে তাহাকে একাকী পাইলে কলে কৌশলে কোন প্রকারে তাহাকে মারিতে হইবে। আজ নিকুম্ভিলা নামে, ইন্দ্রজিৎ একটা বড় যজ্ঞ আরম্ভ করিয়াছে; সেই যজ্ঞ শেষ হইলে, অগ্নিদেব তাহাকে অমর বর দিবেন ও একখানি দিব্য অস্ত্র দিবেন। তাহা পাইলেই ইন্দ্রজিৎ অমর হইবে। অতএব যজ্ঞ শেষ না হইতেই তাহাকে মারিতে হইবে। লক্ষ্মণ ভিন্ন আর কেহই ইন্দ্রজিৎকে মারিতে পারিবে না। লক্ষ্মণকে আমার সঙ্গে পাঠান, আমি সেই যজ্ঞের ঘরের গুপ্তদরজা দিয়া প্রবেশ

করিব এবং হঠাৎ আক্রমণ করিয়া ইন্দ্রজিৎকে মারিয়া আসিব, ইহা ভিন্ন আর গতি নাই। রাম শুনিয়া বলিলেন, বন্ধু! এই বিপদে তুমিই আমার একমাত্র বন্ধু ও মন্ত্রী। তোমার মন্ত্রণা না পাইলে আমি কোন রকমে এ বিপদ্ হইতে উদ্ধার হইতে পারিব না।

আরও বলিলেন, লক্ষ্মণ আমার জীবন ও যথাসর্ব্বস্ব, ইহাকে না দেখিয়া আমি একদণ্ডও বাঁচি না। আমার সীতা উদ্ধার করা না হয় তাহাও ভাল, তথাপি যেন লক্ষ্মণের কোন অনিষ্ট না হয়। দেখিও বন্ধু, তোমার উপর নির্ভর করিয়াই আজ আমি ইহাকে তোমার হাতে দিতেছি, তুমি লক্ষ্মণকে লইয়া দেবীর মন্দিরে যাইয়া দেবীর পূজা কর ও তাঁহার বরে ইন্দ্রজিৎ বধ কর। লক্ষ্মণ বলিলেন, দাদা! তুমি ভাবিও না, বন্ধু বিভীষণের ন্যায় মিত্র তোমার কে আছে? তিনি যাহা বলিতেছেন তাহা অবশ্যই হইবে। আমি আজ দেবতার আশীর্ব্বাদে ও তোমার চরণধূলি লইয়া অনায়াসে ইন্দ্রজিৎ বধ করিব; যে পাপী তাহাকে মারিতে ভয় কি? পাপীর উপর দেবতারাও রাগ করেন, তাঁহারা তাহার বিপক্ষ ভিন্ন সহায় হইবেন না। আপনি স্বচ্ছন্দ মনে আমাকে আশীর্ব্বাদ করুন ও অনুমতি প্রদান করুন।

রাম লক্ষ্মণের কথায় বড় আনন্দিত হইলেন। এবং বলিলেন, এস ভাই, আজ দেবতারা তোমার সহায় হইয়া তোমাকে রক্ষা করুন। তারপর বিভীষণ লক্ষ্মণকে সঙ্গে লইয়া রাত্রিতে লঙ্কার

উত্তর দিকে, দেবীর মন্দিরে যাইয়া, দেবীর পূজা করিলেন। দেবতা সন্তুষ্ট হইলে আর ভাবনা কিসের, তাঁহারা বর দিলে অসাধ্য বিষয়ও তৎক্ষণাৎ সাধিত হয়। দেবতার বরে মরা লোকও পুনরায় বাঁচিয়া উঠে। লক্ষ্মণ ইন্দ্রজিৎকে মারিবার অস্ত্র, বর ও একটী সুন্দর মুকুট দেবীর নিকট হইতে পাইলেন। তখন আনন্দিত মনে বিভীষণের সহিত গুপ্ত দরজা দিয়া ইন্দ্রজিতের নিকুম্ভিলা যজ্ঞের ঘরে ঢুকিতে গেলেন। লক্ষ্মণের সঙ্গে হনুমান্, জাম্বুবান্, নল, নীল, গয় ও গবাক্ষ প্রভৃতি বানরদের অনেক বীর ছিল। দরজায় কয়েক জন রাক্ষস পাহারা ছিল। হনুমান্ এক লাফে গিয়া, একটীর ঘাড়ে চড়িল ও এক চাপড়ে তাহাকে অজ্ঞান করিল। এই প্রকারে আর একটীকে অজ্ঞান করিলেই, বাকী যাহারা ছিল তাহারা প্রাণ বাঁচাইবার জন্য পলাইল। বিভীষণ দরজায় পাহারা দিবার জন্য দাঁড়াইলেন। লক্ষ্মণ ঘরের মধ্যে গেলেন। তথায় যাইয়া দেখেন, ইন্দ্রজিৎ আগুন জ্বালিয়া তাহার নিকটে বসিয়া চক্ষু বুজিয়া ধ্যান করিতেছে, যুদ্ধের কোণ সাজ সজ্জাই নাই, চারিদিকে কোষাকুষী, ফুল, ফল, চাউল ও ঘৃত প্রভৃতি রহিয়াছে, কিন্তু একখানি সামান্য অস্ত্রও নাই। লক্ষ্মণ যুদ্ধের সাজে সাজিয়া গিয়াছেন। হাতে ধনুকবাণ, তরোয়াল ও অনেক রকমের অস্ত্র, লক্ষ্মণের অস্ত্রের শব্দে ইন্দ্রজিৎ চমকিয়া উঠিয়া মনে মনে ভাবিল এই বুঝি অগ্নিদেব আমার পূজায় তুষ্ট হইয়া আমাকে বর দিতে আসিয়াছেন। কিন্তু যখন বুঝিল অগ্নিদেব নয় লক্ষ্মণ,

তখন ভাবিল বুঝি আমাকে ঠকাইবার জন্য লক্ষ্মণের বেশ ধরিয়া আমার সম্মুখে আসিয়াছেন। তখন প্রণাম করিয়া বলিল, দেব ; তোমাকে এতকাল পূজা করিতেছি, এখন সন্তুষ্ট হইয়া বর দিন। আমাদের শত্রু লক্ষ্মণের বেশ পরিত্যাগ করুন, আমাকে অভয় দিন।

ইন্দ্রজিৎ নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারে।

লক্ষ্মণ উত্তর করিলেন, আমি রামের ভ্রাতা লক্ষ্মণ, তোমাকে বর দিতে আসি নাই, বধ করিতে আসিয়াছি, আজ আমি তোমার যম, অতএব যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হও, এখনই আমার সহিত যুদ্ধ করিতে হইবে। ইন্দ্রজিৎ বলিল, যদি যথার্থই তুমি লক্ষ্মণ, তাহা হইলে আগে বল, তুমি কি প্রকারে চোরের মত এই ঘরে আসিলে, শত শত বীর রাক্ষস দরজায় পাহারা দিতেছে, একটী মাছিরও এখানে

আসিবার সাধ্য নাই, তুমি অস্ত্র শস্ত্র লইয়া যুদ্ধের সাজে এখানে কেমন করিয়া আসিলে? লক্ষ্মণ উত্তর করিলেন, যে ভাবে আসিয়াছি তাহার পরিচয়ের সময় নাই, এখন যুদ্ধের জন্য আসিয়াছি তাহারই পরিচয় লও, তুমি কত বড় বীর এখনই তাহার পরীক্ষা হইবে।

লক্ষ্মণের উত্তরে ইন্দ্রজিতের বড় রাগ হইল ও রাগে ফুলিয়া বলিল, আচ্ছা এখনই তোমার যুদ্ধের সাধ মিটাইব, তাহার জন্য ভাবনা কি? আর একটু বিলম্ব কর, এটা যজ্ঞের স্থান, এখানে কোনও অস্ত্র নাই, আমি অস্ত্রাগার হইতে অস্ত্র লইয়া আসি, এই বলিয়া দরজায় আসিয়া দেখেন তাহার খুড়া বিভীষণ দাঁড়াইয়া আছেন। বিভীষণকে দরজায় দেখিয়া বলিল, এখন সব বুঝিয়াছি। খুড়া মহাশয়! আপনার সাহায্যেই দুর্ম্মতি লক্ষ্মণ এই গুপ্ত যজ্ঞের ঘরে আসিয়াছে। যাহা হউক, তাহাতে দুঃখ নাই, কিন্তু লক্ষ্মণ যুদ্ধ করিতে আসিয়াছে, এখানে অস্ত্র নাই, আমি নিরস্ত্র, পথ ছাড়, অস্ত্র আনিয়া লক্ষ্মণের সহিত যুদ্ধ করি ও তাহার যুদ্ধের আশা মিটাই।

বিভীষণ বলিলেন, বাছা! তুমি বুদ্ধিমান্, বুঝিয়া দেখ এখন আমি লঙ্কার রাজা রাবণের দাস নই, রামের আশ্রয় লইয়া তাঁহার দাস হইয়াছি। ভৃত্য হইয়া প্রভুর কার্য্য নষ্ট করিলে বা কার্য্যে অবহেলা করিলে মহাপাপ জন্মে, সকল পাপের উদ্ধার আছে কিন্তু বিশ্বাসভঙ্গ পাপের উদ্ধার নাই; অতএব বুঝিয়া বল আমি এখন কিরূপে তোমার কথায় প্রভুর

বিশ্বাস ভঙ্গ করিয়া মহাপাপে ডুবিব। ইন্দ্রজিৎ অনেক অনুনয় বিনয় করিয়া খুড়া মহাশয়ের নিকট কাঁদিলেন, কিন্তু বিভীষণ কিছুতেই ছাড়িবার নহেন, তিনি ইন্দ্রজিতের কান্নায় কাণও দিলেন না এবং দরজাও ছাড়িলেন না। বরং যাহাতে ইন্দ্রজিৎ বাহির হইতে না পারে এরূপ সাবধান হইয়া দাঁড়াইলেন।

এরূপে ইন্দ্রজিৎ অস্ত্র শস্ত্র না পাইয়া বড়ই রাগিয়া উঠিলেন এবং কোষাকুষী লইয়া লক্ষ্মণকে তাড়িয়া গেলেন, দুইজনে মহাযুদ্ধ বাঁধিল; বাহির হইতে কেহই তাহা জানিতে পারিতেছে না, সকলেই ভাবিতেছে, রাত্রি গেলেই ইন্দ্রজিতের যজ্ঞ হইয়া যাইবে এবং দেবতার বরে রাম লক্ষ্মণকে মারিয়া ফেলিবে, কিন্তু তাহা নয়, আয়ু ফুরাইলে লোহার ঘরের

ইন্দ্রজিৎ বধ।

মধ্যেও সাপ উঠিয়া কামড়ায়। ইন্দ্রজিতের আঘাতে লক্ষ্মণ কাতর হইয়া পড়িলেন সত্য, কিন্তু আর কতক্ষণ, লক্ষ্মণ তীর,

ধনুক, তরোয়াল ও নানা রকম অস্ত্র লইয়া যুদ্ধ করিতেছেন। ইন্দ্রজিতের সে সব কিছুই নাই, কেবল মাত্র কোষাকুষী তাহার সম্বল। দুই চারিবার ঘুরিয়া ফিরিয়া যুদ্ধ করিয়াই, ইন্দ্রজিৎ একেবারে অজ্ঞান হইয়া মাটির উপর পড়িল, তখন লক্ষ্মণ ইন্দ্রজিতের বুকে হাঁটু দিয়া বসিয়া, ইন্দ্রজিতের গলা কাটিয়া ফেলিলেন। কাটা পাঁঠার মত ইন্দ্রজিৎ তখন ধড়ফড় করিয়া মরিয়া গেল। ইন্দ্রজিৎ অন্যকে মারিবার জন্য, যে যজ্ঞ আরম্ভ করিয়াছিল, তাহাতে নিজেই মরিল। সংসারে পরের মন্দ করিতে গেলে আপনার মন্দই আগে হয়। লক্ষ্মণ ইন্দ্রজিৎকে মারিয়া রামের নিকট ফিরিয়া গেলেন। রামের মনে আজ আনন্দ ধরে না। তিনি বিভীষণের সহিত কোলাকুলি করিয়া বলিলেন, বন্ধো! আজ তোমার সাহায্যে লক্ষ্মণ এত বড় শত্রু অনায়াসে মারিয়া ফেলিল। এক্ষণে বুঝিলাম, তোমার মন্ত্রণাতে নিশ্চয়ই সীতার উদ্ধার হইবে।

রাক্ষস-রাজ রাবণ, পুত্রের মৃত্যু সংবাদ শুনিয়া, একেবারে সিংহাসন হইতে অজ্ঞান হইয়া মাটিতে পড়িলেন। কোথায় পুত্র যজ্ঞের শেষ করিয়া,তাঁহার শত্রু বধ করিবে,তাহা না হইয়া সেই যজ্ঞে নিজেই মারা গেল। এইরূপে অকালে ইন্দ্রজিতের মৃত্যু হওয়াতে লঙ্কায় হাহাকার পড়িয়া গেল। ছেলে, বুড়া, যুবা সকলেই তাহার জন্য কান্দিতে লাগিল। ইন্দ্রজিৎ রাবণের উপযুক্ত পুত্র ছিল। তাহার মৃত্যুতে রাবণের সকল আশা ভরসা একেবারে ডুবিয়া গেল। কিছুদিন এই প্রকার শোক দুঃখে কাটিয়া গেল।

তার পর আবার রামের সহিত যুদ্ধের কথা উঠিল। কিন্তু লঙ্কায় আর এমন বীর নাই যে, রামের সহিত যুদ্ধ করিতে পারে।

কুম্ভকর্ণ নামে রাবণের আর এক ভাই ছিল। সে বড় বীর, কুম্ভকর্ণের সহিত যুদ্ধে কাহারও রক্ষা নাই। কিন্তু তাহার এক দোষ, কুম্ভকর্ণ বড় ঘুমায়। একরাত্রি জাগিলে সে ছয় মাস ঘুমায়, আর সে ঘুম ভাঙ্গান বড় কঠিন, কিছুতেই তাহার ঘুম ভাঙ্গে না। এইজন্য যে অধিক নিদ্রা যায় লোকে তাহাকে বলে কুম্ভকর্ণের ন্যায় ঘুমাইতেছে। লঙ্কায় যে এইরূপ হুলস্থূল মহাব্যাপার চলিতেছে, বড় বড় বীর সকল যুদ্ধে মরিতেছে, কুম্ভকর্ণ ইহার কোন খবরই রাখে না। সে অকাতরে ঘুমাইতেছে, কাহার সাধ্য তাহার ঘুম ভাঙ্গাইবে।

শেষে সকলে পরামর্শ করিল, কুম্ভকর্ণের ঘুম ভাঙ্গাইতে হইবে। তখন দলে দলে রাক্ষস ঘুম ভাঙ্গাইতে যাইয়া কুম্ভকর্ণের কাণের কাছে চীৎকার করিতে লাগিল ও কুম্ভকর্ণকে মারিতে আরম্ভ করিল। কিন্তু কিছুতেই তাহার ঘুম ভাঙ্গিল না। কুম্ভ-কর্ণ যখন নিশ্বাস টানিয়া লয়, তখন হাজার হাজার রাক্ষস তাহার নিশ্বাসের সঙ্গে নাকের মধ্যে চলিয়া যাইতে লাগিল। আবার নিশ্বাস ছাড়িবার সময় হুড়পাড় করিয়া তাহারা বাহির হইতে লাগিল। এইরূপে রাক্ষসদের দুর্দ্দশার একশেষ হইল, তাহাতে কুম্ভকর্ণের চৈতন্য নাই। তখন আর একদল রাক্ষস ঢাক ঢোল আনিয়া কুম্ভকর্ণের কাণের নিকট বাজাইতে আরম্ভ করিল। কুম্ভকর্ণের নাকের ঘড় ঘড় শব্দের সহিত ঢাক ঢোলের

শব্দ মিশিয়া একটী ভীষণ শব্দ হইতে লাগিল। তাহাতেও তাহার ঘুম ভাঙ্গিল না। অবশেষে কতকগুলি হাতী আনিয়া কুম্ভকর্ণের গায়ের উপর উঠাইয়া দিল। এইবার তাহার ঘুম ভাঙ্গিল।

কুম্ভকর্ণের নিদ্রাভঙ্গ।

কুম্ভকর্ণ ঘুম হইতে উঠিয়া অসময়ে তাহাকে জাগাইবার জন্য রাগিয়া উঠিল এবং পরে ইন্দ্রজিৎ ও লঙ্কার অন্যান্য বড় বড় বীরের মৃত্যু শুনিয়া দুঃখিত হইল। তার পর খুব আড়ম্বর করিয়া যুদ্ধের আয়োজন করিতে বলিল। ইন্দ্রজিতের মৃত্যুতে যাহারা তখন পর্য্যন্তও দুঃখ করিতেছিল, তাহারাও কুম্ভকর্ণের সহিত পুনরায় যুদ্ধে যাইবার জন্য সাজিতে লাগিল। কুম্ভকর্ণ খুব ধূমধামে যুদ্ধ করিতে আসিল। এবং বানরদিগকে লণ্ডভণ্ড

করিয়া তুলিল। বানরেরা কেহ লাফ দিয়া কুম্ভকর্ণের ঘাড়ে চড়িয়া বসিল, কেহ বা তাহার নাক কাণ ছিঁড়িয়া দিল। কিন্তু তাহাতে কুম্ভকর্ণের ভ্রূক্ষেপ নাই। মত্ত হইয়া কেবল সে যুদ্ধ করিতেছে। কুম্ভকর্ণ গদা ঘুরাইয়া রামের মাথায় একটী গদার ঘা মারিল, তাহাতে রাম অজ্ঞান হইয়া পড়িলেন। তৎক্ষণাৎ বানরের দল আসিয়া, চারিদিক্ হইতে কুম্ভকর্ণের ঘাড়ে চড়িয়া বসিল। এবং তাহার নাক কাণ ছিঁড়িয়া সকল শরীর আচ্‌ড়াইয়া কাম্‌ড়াইয়া ঘা করিয়া দিল, তাহাতে কুম্ভকর্ণের শরীর হইতে রক্তের স্রোত বহিতে লাগিল।

ইতিমধ্যে রাম উঠিয়া বাছা বাছা বাণ লইয়া আবার কুম্ভকর্ণের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন। চারিটী বাণ দিয়া কুম্ভকর্ণের দুই হাত কাটিয়া ফেলিলেন। আর চারিটী বাণ তাহার বুকে মারিলেন, তাহাতে কুম্ভকর্ণ অজ্ঞান হইয়া পড়িল। তখন দলে দলে বানর আসিয়া, তাহার উপর পড়িয়া মনের সাধে তাহাকে মারিতে লাগিল। আর আর রাক্ষসেরা কুম্ভ-কর্ণের দশা দেখিয়া যে, যে পথে পারিল প্রাণ লইয়া পলাইল। কুম্ভকর্ণ বধ করিয়া বানরেরা জয়রাম, শ্রীরাম শব্দে লঙ্কা তোল-পাড় করিয়া তুলিল; কুম্ভকর্ণের মৃত্যুর পর লঙ্কায় এক এক করিয়া যত বীর ছিল, সকলেই যুদ্ধ করিতে আসিল। আর এক এক করিয়া সকলেই মরিতে লাগিল। ত্রিশিরা নামে একটা রাক্ষস আসিয়া ভারি যুদ্ধ করিল। তার পর নরান্তক, দেবান্তক, মত্ত লম্বোদর এবং আরও কত কত রাক্ষস যুদ্ধ করিতে আসিয়া

এক এক করিয়া মরিল। অতিকায় নামে রাবণের আর একটী ছেলে ছিল। সে বড় মোটা, দাঁড়াইলে বোধ হয় যেন একটা পাহাড় দাঁড়াইয়া আছে। তাহার সহিত লক্ষ্মণের বড় যুদ্ধ আরম্ভ হইল। অনেকক্ষণ যুদ্ধ করার পর লক্ষ্মণ ব্রহ্মাস্ত্র ছাড়িয়া তাহার মাথা কাটিয়া ফেলিলেন।

লঙ্কায় যত বীর ছিল, তাহারা একে একে রাম লক্ষ্মণের হাতে মরিল। লঙ্কাপুরী প্রায় বীরশূন্য হইয়াছে। শোকে ও দুঃখে রাবণের রাগ ক্রমে বাড়িয়া উঠিল। এবার নিজেই যুদ্ধে যাইবে স্থির করিয়া,লঙ্কায় যে সকল বীর বাঁচিয়াছিল, সকলকেই যুদ্ধে যাইবার জন্য উদ্যোগ করিতে হুকুম দিল। রাবণ বড় শিবভক্ত ছিল, যুদ্ধে যাইবার পূর্ব্বে, ভক্তিভাবে শিবের পূজা করিল। মহাদেব পূজায় সন্তুষ্ট হইয়া রাবণকে অভয় দিলেন। দেবতা সন্তুষ্ট হইলে,খোঁড়াও পাহাড় পার হইতে পারে, বোবাও কথা কহিতে পারে, যাহা অসাধ্য তাহাও অনায়াসে সাধিত হয়। শিবের অভয়ে রাবণের আনন্দের সীমা রহিল না। রাবণ মহা বিক্রমে যুদ্ধ করিতে চলিল। রণস্থলে উপস্থিত হইয়া লক্ষ্মণের সহিত অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত যুদ্ধ করিল, পরে শক্তি নামে একটা প্রকাণ্ড বাণ ছাড়িল। বাণটা মহাশব্দ করিয়া আসিয়া লক্ষ্মণের

রাবণের শিবপূজা।

বুকে পড়িল, লক্ষ্মণ সেই বাণ খাইয়া একেবারে অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া গেলেন। তাঁহার আর কোন ক্ষমতা নাই একেবারে মরার মত পড়িয়া রহিলেন। রাক্ষসেরা,জয় রাবণের জয়,করিতে করিতে লঙ্কায় ফিরিয়া গেল। বানরেরা অজ্ঞান অবস্থায় লক্ষ্মণকে লইয়া রামের কাছে আসিল। তাঁহাদের আজ দুঃখের অবধি রহিল না। রাম, লক্ষ্মণের শোকে একেবারে পাগলের মত হইয়া উঠিলেন। কি সর্ব্বনাশ হইয়াছে প্রথমে কেহই বুঝিয়া উঠিতে পারে নাই। বিভীষণ রামের দশা দেখিয়া বড়ই বিপদে পড়িলেন, কি করিয়া তাঁহাকে প্রবোধ দিবেন ভাবিয়া পান না। তিনি অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত লক্ষ্মণের শরীর পরীক্ষা করিয়া দেখিয়া বুঝিলেন, রাবণ লক্ষ্মণের বুকে যে শক্তিশেল নামে বাণ মারিয়াছে, তাহার যন্ত্রণায় লক্ষ্মণ অজ্ঞান হইয়া পড়িয়াছেন। বাস্তবিক লক্ষ্মণের জীবন যায় নাই। উপযুক্ত চিকিৎসা ও ঔষধ হইলে পুনরায় লক্ষ্মণ বাঁচিয়া উঠিবেন।

বিভীষণ রামকে শান্ত করিয়া বলিলেন, লক্ষ্মণের জন্য চিন্তা করিবেন না। তাঁহার মোহ হইয়াছে, প্রাণ যায় নাই। ইহার উপযুক্ত ঔষধ আছে, আনিয়া দিতে পারিলে পুনরায় লক্ষ্মণের জ্ঞান হইবে। বিভীষণের এই কথায় রামের যে কি আনন্দ হইল, তাহা বলিবার নয়,লক্ষ্মণ পুনরায় বাঁচিবে এই কথা শুনিয়া যেন রাম তখন বাঁচিয়া উঠিলেন এবং কি ঔষধ, কোথায় তাহা পাওয়া যায়, জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। বিভীষণ বলিলেন উত্তর দিকে গন্ধমাদন নামে একটী পর্ব্বত আছে। তাহার উপর

বিশল্যকরণী নামে এক প্রকার লতা আছে। তাহাই লক্ষ্মণের প্রাণ পাইবার একমাত্র ঔষধ। কিন্তু এই প্রকার অজ্ঞান অবস্থায় বেশীক্ষণ থাকিলে প্রাণ যাইবারও আশঙ্কা আছে। এজন্য আজ রাত্রির মধ্যেই ঔষধ আনিয়া ইহার প্রাণ বাঁচাইতে হইবে।

রাম ঔষধের কথা শুনিয়া একেবারে হতাশ হইলেন ; এবং বলিলেন, এমন কে আছে যে, এই রাত্রির মধ্যেই এত দূর হইতে ঔষধ আনিয়া লক্ষ্মণকে বাঁচাইবে। রামকে এইরূপ কাতর ও বিলাপ করিতে দেখিয়া হনুমান বলিল, প্রভু ভয় কি। গন্ধমাদন পর্ব্বত যত দূর হউক না কেন, আপনার আশীর্ব্বাদে আজ রাত্রির মধ্যেই ঔষধ আনিয়া দিব।

এই বলিয়া হনুমান রামের পদধূলি লইয়া জয় রাম, শ্রীরাম বলিতে বলিতে গন্ধমাদন পর্ব্বতে চলিল। হনুমান গন্ধমাদনে যাইয়া বড় বিপদে পড়িল, কোন রূপেই সে বিশল্যকরণী লতা চিনিতে পারিল না। সেখানে এক রকমের অনেক লতা গাছ আছে, তাহার মধ্যে কোন্‌টী বিশল্যকরণী বুঝিতে না পারিয়া, গন্ধমাদন পর্ব্বতটী মাথায় করিয়া, রাত্রির মধ্যেই রামের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইল। হনুমানের বীরত্ব দেখিয়া সকলে চমৎকৃত হইল। বিভীষণ ঔষধ দিয়া লক্ষ্মণকে বাঁচাইলেন। তখন সেখানে মহানন্দে ধূম পড়িয়া গেল। সকলেই তখন হনুমানের সুখ্যাতি করিতে লাগিল।

ইহার মধ্যে মহীরাবণ নামে রাবণের একটা ছেলে ছিল। সে খুব যুদ্ধ করিতে জানিত। এবারে রাবণ তাহাকেই যুদ্ধে

পাঠাইল। সে যুদ্ধে আসিয়া রাম ও লক্ষ্মণের সহিত অনেকক্ষণ যুদ্ধ করিল। কিন্তু কিছুতেই পারিয়া উঠিল না। শেষে নাগপাশ বলিয়া এক রকম বাণ ছিল, সে বাণ যাহাকে মারিবে সাপ হইয়া তাহাকে বাঁধিয়া ফেলিবে, মহীরাবণ সেই বাণ মারিল। রাম লক্ষ্মণ দুই ভাই সাপের বন্ধনে বাঁধা পড়িলেন,আর যুদ্ধ করিবার ক্ষমতা নাই, একেবারে হাত পা বাঁধা হইয়া মরার মত হইয়া পড়িলেন। বানরেরা আর কোন উপায় না দেখিয়া সাপের ভয়ে গরুড়কে ডাকিতে লাগিল, গরুড় খুব বড় একটা পাখী,শ্রীকৃষ্ণের বাহন। গরুড়কে আসিতে দেখিয়া, সাপগুলা বাঁধন ছাড়িয়া কোথায় পলাইল তাহার ঠিক নাই। সে বিপদ্ হইতে রাম লক্ষ্মণ উদ্ধার পাইলেন।

তার পর মহীরাবণের সহিত আবার রাম লক্ষ্মণের যুদ্ধ বাধিল। এবার আর মহীরাবণের নাগপাশ বাণে কুলাইল না। কিছুক্ষণ ধরিয়া যুদ্ধ করিবার পর রাম তিন বাণে মহীরাবণের মাথা কাটিয়া মাটীতে ফেলিলেন; তাহা দেখিয়া যে সকল রাক্ষস বাঁচিয়া ছিল তাহারা পলাইল। বানরেরা রামের জয় গান করিতে করিতে ফিরিল।

এখন লঙ্কায় আর বীর নাই, যে রাম লক্ষ্মণের সহিত যুদ্ধ করে। এজন্য এবার রাবণের পালা। রাবণ একবার যুদ্ধে আসিয়া লক্ষ্মণকে শক্তিশেল মারিয়া বড় সাহস হইয়াছে। সেবার যুদ্ধে জয় হইয়াছিল, সেই আশায় রাক্ষসেরা আবার রাবণের সহিত যুদ্ধে যাইবার জন্য সাজিল। তাহারা ভাবিতে লাগিল,

রাবণ প্রথমবার যুদ্ধে লক্ষ্মণকে মারিয়া আসিয়াছিল। আর এবার রামকে মারিয়া ফেলিবে। না হয় বাঁধিয়া আনিবে, তাহা হইলেই সকল গোলমাল মিটিয়া যাইবে। আর বার বার যুদ্ধে যাইতে হইবে না। এই সব ভাবিয়া রাক্ষসেরা এবার খুব জাঁকজমকের সহিত যুদ্ধে চলিল। রামের পক্ষ হইতে বানরেরাও ভাবিতে লাগিল, লঙ্কার সব বীর মরিয়া গিয়াছে, একমাত্র রাবণ অবশিষ্ট আছে। ইহাকে মারিতে পারিলেই সীতার উদ্ধার হইবে। এই ভাবিয়া দ্বিগুণ বলে তাহারা যুদ্ধে চলিল, কোন পক্ষেরই সাজ সজ্জার কিছুমাত্র ত্রুটী হইল না।

রামরাবণের যুদ্ধ।

প্রথম দিন খুব যুদ্ধ হইল। তাহাতে অনেক রাক্ষস মরিল।

বানরের মধ্যেও বিস্তর মরিল। কিন্তু কোন পক্ষেই হার জিৎ কিছুই ঠিক হইল না। সমস্ত দিন যুদ্ধ চলিল, পরে রাত্রি আসিলে যুদ্ধ থামিল। সকলেই তখন বিশ্রাম করিতে লাগিল। তার পর দিন আবার যুদ্ধ আরম্ভ হইল। রাম যেমন রাবণকে অস্ত্র মারেন, রাবণ তখনই আর এক অস্ত্র মারিয়া রামের অস্ত্র কাটিয়া ফেলে। এই রকম অস্ত্রে অস্ত্রে, বাণে বাণে, কাটা কাটি চলিল। অনেকক্ষণ পরে রাম খুব সাবধানের সহিত লক্ষ্য করিয়া রাবণকে এক অস্ত্র মারিলেন, তাহা একেবারে রাবণের বুকে যাইয়া বিঁধিল। এইবার রাবণ্ কুড়ি হাত ও দশমুণ্ড বাহির করিয়া যুদ্ধ করিতে লাগিল। বাণের উপর বাণ চলিতে লাগিল, ঠিক যেন বাণের বৃষ্টি হইতেছে বোধ হইতে লাগিল। সকল বাণ নিবারণ করা রামের উপর কঠিন হইয়া উঠিল। কতকগুলি বাণ রামের গায়ে আসিয়া লাগিল। তাহা দেখিয়া অঙ্গদ লাফ দিয়া রাবণের ঘাড়ে চড়িল ও দশ মুণ্ডের উপর উঠিয়া এক একটী কান ধরিয়া মোচ্‌ড়াইতে আরম্ভ করিল। রাবণ তৎক্ষণাৎ পাঁচটী বাণ মারিয়া মাথা হইতে অঙ্গদকে ফেলিয়া দিলেন। এই রকম রাম ও রাবণে ঘোরতর যুদ্ধ চলিল। হনুমান, জাম্বুবান, গয়, গবাক্ষ ও আর আর বানরেরা ও মহোদর, দীর্ঘকর্ণ, বক্রনখ ও বিকটাক্ষ প্রভৃতি রাক্ষসদিগের সহিত প্রাণপণে যুদ্ধ করিতে লাগিল। কখনও বানরেরা দুর্ব্বল হইয়া পড়িতেছে, আবার কখনও বা রাক্ষসেরা মর মর হইতেছে, কিন্তু তথাপি কেহই যুদ্ধ করিতে ছাড়িতেছে না। চারিদিক্ হইতে কেবল মারমার শব্দ উঠিতেছে।

একদিকে রাক্ষসের ভয়ানক হুঙ্কার শব্দ, অন্য দিক্ হইতে বানরের কিচিমিচি, এই দুইটী শব্দ মিলিয়া আকাশ পূরিয়া কেবল শব্দই চলিতেছে। বর্ষাকালে মেঘের ঘন ঘন গভীর ডাক, ও থাকিয়া থাকিয়া বজ্রের কড় কড় শব্দ, যেমন ভয়ানক হইয়া উঠে, রাম ও রাবণের যুদ্ধের শব্দ তাহা হইতেও বেশী হইয়া উঠিল। লঙ্কার পশুপক্ষী, কীটপতঙ্গ পর্য্যন্ত ভয়ে জড় সড় হইয়া যে যাহার আশ্রয়ে পলাইল। চারি দিক্ নিস্তব্ধ, লঙ্কায় যেন জনপ্রাণী নাই, এমন কি যেন বাতাস পর্য্যন্তও বহিতেছে না, সকলই চমৎকৃত হইয়া সেই যুদ্ধ দেখিতেছে। সে দিন এমনই ভয়ানক যুদ্ধ হইয়াছিল, যে এখনও লোকে খুব বড় মারামারি বা দাঙ্গা হাঙ্গাম উপস্থিত হইলে বলে "যেন রাম রাবণের যুদ্ধ।"

এইরূপ যুদ্ধে তিন চারি দিন কাটিয়া গেল। ক্রমেই রাম দুর্ব্বল হইয়া পড়িতে লাগিলেন। কিছুতেই রাবণকে পরাজয় করিতে পারিলেন না। তখন সীতার উদ্ধার বিষয়ে হতাশ হইয়া বিভীষণকে বলিলেন, মিত্র বিভীষণ! সমুদ্র বাঁধিয়া লঙ্কায় আসিলাম ও তোমার মন্ত্রণায় একে একে সকল বীরকেই মারিলাম, কিন্তু এখন দেখিতেছি সকলই বৃথা হয়। রাবণকে বিনাশ করা আমার সাধ্য নয়, যুদ্ধের চূড়ান্ত হইতেছে, কিন্তু রাবণ কিছুতেই মরিবার নয়, বরং ক্রমে তাহার বল বাড়িতেছে। আমার সেনা ক্রমে দুর্ব্বল হইয়া পড়িতেছে, যুদ্ধ জয়ের আর কোনও উপায় দেখি :না, তোমার পরামর্শ ভিন্ন এই রাক্ষসের

লঙ্কায় সবই নিষ্ফল হইল। এখন বল, কি উপায়ে রাবণকে বধ করা হইবে।

বিভীষণ উত্তর করিলেন, মিত্র! ভয় নাই, রাক্ষসেরা পাপী, রাবণ তাহার মধ্যে একজন মহাপাপী। তাহার সময় প্রায় শেষ হইয়া আসিল, শীঘ্রই তাহার পতন হইবে। শিবের বরে রাবণের এত বল। রাবণ শিবের নিতান্ত ভক্ত, দেববলে বলবান্ বলিয়াই তাহাকে মারা কঠিন হইয়া উঠিয়াছে। এজন্য বন্ধো! তুমিও শক্তির পূজা কর, তিনি সন্তুষ্ট হইলেই, রাবণ বধ হইবে। এই সময়ে দশভুজার পূজা করিয়া তাঁহাকে সন্তুষ্ট কর। নীলপদ্ম দ্বারা জগৎ মাতার আরাধনা করিলে, তিনি সন্তুষ্ট হইয়া তোমাকে বর

রাম কর্ত্তৃক দশভুজার পূজা।

দিবেন। বিভীষণের পরামর্শমত রাম শক্তির পূজা করিলেন, হনুমান নীলপদ্ম আনিয়া দিল। রাম একান্ত ভক্তিযুক্ত মনে ভগবতীর পাদপদ্মে চন্দনমাখা নীলপদ্ম প্রদান করিলেন। ভগবতী পূজায় সন্তুষ্ট হইয়া রামকে রাবণ বধের বর দিলেন। তখন

বিভীষণ বলিয়া দিলেন যে, রাবণের বাড়ীর মধ্যে তাহার মৃত্যু-বাণ আছে, সেই বাণ ভিন্ন অন্য কোন বাণে রাবণের মৃত্যু নাই। রাবণের রাণী মন্দোদরী ভিন্ন অন্য কেহই তাহার খবর জানে না, সেই বাণ আনিয়া তাহার দ্বারা রাবণকে মারিতে না পারিলে রাবণ কিছুতেই মরিবে না।

হনুমান্ একবার সীতার সংবাদ আনিবার সময় রাবণের বাড়ীর সব জায়গায় ঘুরিয়াছে। এজন্য সে সব জানে বলিয়া ছল করিয়া ঐ মৃত্যুবাণ আনিবার জন্য দৈবজ্ঞের বেশে ফাঁক খুঁজিয়া রাবণেরবাড়ীর ভিতরে প্রবেশ করিল ও নানারূপ কৌশল করিয়া মন্দোদরীকে ভুলাইল। স্ত্রীলোকেরা অতি অল্পেই বুদ্ধি হারাইয়া ফেলে, বিশেষতঃ গণক দেখিলে তাহাকে একেবারে

হনুমান। ও মন্দোদরী।

সর্ব্বজ্ঞ দেবতার মত মনে করে। হনুমান এইরূপ সুযোগ পাইয়া

ক্রমে মন্দোদরীর মুখ হইতে সকল কথাই বাহির করিয়া লইল। শেষে ফাঁকি দিয়া রাবণের মৃত্যুবাণটী লইয়া নিজ মূর্ত্তি ধারণ করিল। এবং এক লাফে রামের নিকটে বাণ লইয়া উপস্থিত হইল। রাম আনন্দিত মনে হনুমানকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। এক দিকে দেবতার বর, অপর দিকে রাবণের মৃত্যুবাণ, এই দুটী এক সঙ্গে পাইয়া রাম লক্ষ্মণের ও বানরদিগের আর আনন্দের অবধি নাই। ইন্দ্র স্বর্গ হইতে রামের জন্য রথ পাঠাইলেন, সেই রথে উঠিয়া রাম ও রাবণের শেষ যুদ্ধ বাধিল, রাক্ষসেরা প্রাণপণে যুদ্ধ করিতেছে, বানরেরাও মনের আনন্দে তাহাদের বল পরীক্ষা করিতেছে। বড় বড় রাক্ষসেরা জলে পড়া মানুষের মত যুদ্ধে হাবু ডুবু খাইতে লাগিল। যুদ্ধের ঘটা ক্রমে আরও বাড়িতেছে। অন্যান্য দিনের মত রাম ও রাবণের সেইরূপ ঘোরতর যুদ্ধ চলিতেছে কখনও রাবণের জয় হয় হয় হইতেছে, আবার তখনই রামের দুই একটী বাণেই রাবণ যায় যায় হইতেছেন। কাহারও হাত কাটিতেছে, কাহারও পা কাটিতেছে, আর ঝড়ে গাছ ভাঙ্গিবার মত এক একটা রাক্ষস বিকট চীৎকার করিয়া পড়িতেছে ও মরিতেছে। কোন রাক্ষসের একেবারেই মাথা কাটা যাইতেছে আর দুম দাম শব্দে পড়িতেছে। যুদ্ধের জায়গা হইতে রক্তের স্রোত বহিতে লাগিল।

এবার রাম, রাবণের মৃত্যুবাণ ধনুকে জুড়িলেন। রাবণ রামের ধনুকে তাহার মৃত্যুবাণ দেখিয়া চমকিয়া উঠিল ও বুঝিতে পারিল এবার রামের হাতেই, আমার মরণ লেখা আছে। আজ

আর উদ্ধার নাই। বীরের ধর্ম্ম একবার যুদ্ধে আসিলে মরিবে তাহাও ভাল, তবুও যুদ্ধে ভঙ্গ বা পলায়ন করিবে না। রাবণ মরণ নিশ্চয় জানিয়াও যুদ্ধ ছাড়িল না। রাম কান পর্য্যন্ত ধনুকের গুণ টানিয়া বাণ ছুড়িলেন, বাণ বজ্রের মত শব্দ করিয়া রাবণের বুকে বিঁধিয়া গেল। এইবার রাবণ রথের উপর অজ্ঞান হইয়া পড়িলেন। রাক্ষসদিগের মধ্যে হাহাকার পড়িয়া গেল, রাবণকে সেই অজ্ঞান অবস্থায় লঙ্কায় ফিরাইয়া লইয়া গেল ও প্রাণপণে সকলে তাহার সেবা শুশ্রূষা করিতে ও নানা রকমের ঔষধ দিতে আরম্ভ করিল। কিছুক্ষণ পরে রাবণের জ্ঞান হইল, কিন্তু মৃত্যুবাণ বুকে বিঁধিয়া গিয়াছে তাহার যাতনা ক্রমেই বাড়িতেছে, জীবনের আশা আর নাই।

রাবণ সেই মর-মর অবস্থায় অতি দুঃখের সহিত বলিতে লাগিল। "আমি পাপী, বিনা দোষে রামের সীতাকে চুরী করিয়াছিলাম, ও আর আর কতই অধর্ম্মের কাজ করিয়াছি, আজ তাহার ফল পাইলাম। আমার শেষ সময় উপস্থিত, এখন বেশ বুঝিতেছি আমার নিজের দোষেই, ও অতিশয় দর্প অহঙ্কারেই এই সোনার লঙ্কা ছার খারে গেল। লঙ্কায় যে এত বড় বড় বীর ছিল, তাহারা সকলেই একে একে অকালে প্রাণ হারাইল। অবশেষে এইবার আমিও পাপের সম্পূর্ণ প্রতিফল পাইলাম। চিরকালই ধর্ম্মের জয় হইয়া আসিতেছে, অধর্ম্ম এ সংসারে কখনই জয় লাভ করিতে পারে না। লোকে টাকা কড়িতে উন্মত্ত হইয়া নিজের ভাল মন্দ বুঝিতে পারে না, অল্প সুখের

জন্য একটু পাপ করিয়া চিরকাল অসীম কষ্ট পায় ও তাহার জন্য অনুতাপ করে। পাপীকে ভাল কথা বলিলেও সে তাহা শুনে না। পাপের লোভে ভাল কথাও তাহার নিকট মিষ্ট লাগে না। লোকে আমাকে দেখিয়া শিখুক, আর যেন পৃথিবীতে কেহ কখনও অন্যায় কাজ করে না। রাম দেবতা, আমি না বুঝিয়া তাঁহার সীতা চুরী করিয়াছিলাম এবং পতিব্রতা সতীকে কত যাতনা দিয়াছি। তাহার চক্ষের জলে এই রাক্ষসবংশ লোপ হইল। এইরূপ বিলাপ করিতে করিতে রাবণ মরিয়া গেল।

রাবণের মৃত্যুতে লঙ্কায় হাহাকার পড়িয়া গেল, মন্দোদরী ও রাবণের আর আর রাণীরা চীৎকার করিয়া কাঁদিতে লাগিল। রাবণের মৃত্যুর পর বিভীষণও দুঃখ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। রাবণ বিভীষণের বড় ভাই, তাহার নিকটে অপমানিত হইয়া রাবণের শত্রু রামের পক্ষে আসিলেও বড়ভাইএর উপর তাঁহার ভালবাসা একেবারে যায় নাই, এজন্য তাহার মৃত্যুতে বিভীষণের প্রাণে বড় ব্যথা লাগিল। রামচন্দ্র বিভীষণকে অনেক বুঝাইলেন, নিজের কর্ম্মের দোষে সকলে অকালে মরে, আপনার ইচ্ছাক্রমে কেহ মরিতে কি বাঁচিতে পারে না।

তারপর বিভীষণ ও আর আর রাক্ষসেরা মিলিয়া রাবণের মৃতদেহ লইয়া সমুদ্রের তীরে পোড়াইয়া ফেলিল। লঙ্কার রাজ্যে আর রাজা নাই, রাজার অভাবে রাজ্য চলে না। রাবণের ছেলেরাও কেহ বাঁচিয়া নাই, তাহার বংশের মধ্যে কেবল মাত্র বিভীষণ বাঁচিয়া আছে ও রাক্ষসেরা সকলে বিভীষণকেই

লঙ্কার সিংহাসনে বসাইলেন, বিভীষণ লঙ্কার রাজা হইলেন ও তাঁহার স্ত্রী সরমা রাণী হইলেন।

রাবণের মৃত্যুর পরই লঙ্কার যুদ্ধ ফুরাইল সকলই সুস্থ হইল, তারপর বিভীষণ রাজা হওয়ায় আর কোন গোলযোগই নাই। হনুমান অশোকবনে সীতার নিকট গমন করিল, সীতা হনুমানকে দেখিয়া বড়ই আনন্দিত হইলেন এবং এবার দুঃখের শেষ হইয়াছে বুঝিলেন! হনুমান সীতাকে প্রণাম করিয়া বলিল, মা জানকি! এবার রাবণ বধ হইয়াছে, দুষ্ট তাহার পাপ কাজের উচিত শাস্তি পাইয়াছে। আপনাকে প্রভু রামচন্দ্রের নিকট লইয়া যাইবার জন্য আমি আসিয়াছি। হনুমানের কথায় সীতা বড়ই আহ্লাদিত হইলেন। তারপর হনুমান্, চেড়ী ও রাক্ষসীদলের সহিত সীতাকে লইয়া অতি সাবধানে রামের নিকট উপস্থিত হইল। তথায় রাম, লক্ষ্মণ, বিভীষণ ও অন্যান্য বানর এবং রাক্ষসগণ বসিয়া ছিল, সীতাকে আসিতে দেখিয়া সকলেই আনন্দে জয় রাম, শ্রীরাম বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিল। সুগ্রীব রামের নিকট যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, এত দিনে তাঁহার সেই প্রতিজ্ঞা পূরণ হইল। রাম যেমন বালিকে বধ করিয়া, সুগ্রীবকে কিষ্কিন্ধ্যার রাজা করিয়াছিলেন, সুগ্রীবও সেইরূপ রাবণ বধে সাহায্য করিয়া সীতার উদ্ধার করিলেন। এখন রাম সীতাকে পুনরায় প্রাপ্ত হইলেন।

রাম বড় ধর্ম্মে ভয় করিতেন। মানুষের মত তাঁহারও ধর্ম্ম কর্ম্ম করিতে হইত। সমাজের নিয়ম অনুসারে চলিতে হইত।

মানুষেরা যে কাজ যে ভাবে করে, তাঁহার সে সকলই সেই ভাবে করিতে হইত। তিনি রাজার ছেলে, কেহ তাঁহার কোন কাজে কোন রূপ দোষ দিতে না পারে, তাহাই সকলের আগে দেখিতে হইত। তাঁহার কাজে দোষ দেখিলে সকলেই মন্দ

সীতার অগ্নি-পরীক্ষা।

কার্য্য করিবে, এজন্য সে বিষয়ে তাঁহাকে সর্ব্বদা সাবধান হইয়া চলিতে হইত। রাবণ সীতাকে চুরী করিয়া আনিবার পর হইতে সীতা রাবণের গৃহে ছিলেন, এজন্য তাঁহার চরিত্র পরীক্ষার নিমিত্ত সকলের সম্মুখে সীতার অগ্নি-পরীক্ষা করা হইল। এক প্রকাণ্ড অগ্নিকুণ্ড জ্বালা হইল, সীতা কান্দিতে

কান্দিতে বলিলেন, হে অগ্নিদেব! যদি আমার পাপ থাকে তবে তুমি আমাকে পোড়াইয়া ফেলিও, আর যেন আমি ফিরিয়া না আসি, এই বলিয়া সীতা আগুনে পড়িলেন। একটু পরেই সেই আগুন হইতে, আগুনের মত জ্বলন্ত শরীরে অগ্নিদেব সীতাকে লইয়া বাহির হইলেন; এবং সকলের সাক্ষাতে বলিলেন, সীতা নিষ্পাপ, ইঁহার কোন দোষ নাই। রাম, তুমি স্বচ্ছন্দে ইঁহাকে গ্রহণ কর। এই কথা বলিবা মাত্র আকাশ হইতে পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল, ও চারিদিক্ হইতে জয় ধর্ম্মের জয় বলিয়া চাৎকার উঠিতে লাগিল; সকলেই সীতার প্রশংসা করিতে লাগিল, এবং তাঁহাকে প্রণাম করিল। রাম তাঁহার ধর্ম্মপত্নী সীতাকে গ্রহণ করিলেন। রাক্ষসেরা দেবতাদিগের শত্রু ছিল, রাম রাক্ষস মারিয়া ফেলিয়াছেন, তাহাতে ইন্দ্র ও আর আর দেবতারা বড়ই আনন্দিত হইয়াছেন। সীতার অগ্নিপরীক্ষা হইবার সময় তাঁহারা আসিয়াছিলেন, সন্তুষ্ট হইয়া রামকে বর দিলেন এবং সীতাকে লইয়া অযোধ্যা যাইবার জন্য স্বর্গ হইতে পুষ্পক নামে ইন্দ্রের রথ পাঠাইয়া দিলেন।

আকাশ হইতে রথ আসিলে রাম, লক্ষ্মণ ও সীতা রথে উঠিয়া অযোধ্যায় যাত্রা করিলেন। বিভীষণ, হনুমান ও আর আর রাক্ষসেরা ভিন্ন ভিন্ন রথে চড়িয়া রামের সহিত সমুদ্র পার হইয়া অযোধ্যায় চলিলেন। তখন লঙ্কা হইতে অযোধ্যায় যাইবার জন্য মহা ধূম পড়িয়া গেল।

ইন্দ্রের পুষ্পক রথ আকাশ দিয়া চলিতে পারে। তাহাতে

ভাল ভাল উড়ুক্কু ঘোড়া যোড়া আছে এবং ইহা ইন্দ্রের সারথি চালায়, এক নিমেষের মধ্যে রাম লক্ষ্মণ ও সীতাকে লইয়া সমুদ্র, এবং পঞ্চবটী বন পার হইয়া আসিল। আকাশে মেঘের মধ্যদিয়া আসিবার সময় রাম সীতাকে সমুদ্র, পঞ্চবটী বন ও সীতা যে যে স্থানে বেড়াইতেন সেই সকল দেখাইতে লাগিলেন। পরে ভরদ্বাজ নামে একজন মুনি থাকিতেন, রাম বনে যাইবার সময় তাঁহার আশ্রমে এক দিন ছিলেন, এবার অযোধ্যায় ফিরিয়া যাইবার সময় আর একবার ভরদ্বাজ মুনির আশ্রমে নাবিলেন ও সকলে মুনিকে প্রণাম করিলেন। মুনি তাঁহাদিগকে দেখিয়া বড়ই আনন্দিত হইলেন এবং তাঁহাদিগকে নানা রকম ফল, ঝরণার জল খাইতে দিলেন। তাঁহার কুটীরে একরাত্রি থাকিয়া ও পরদিন প্রাতঃকালে তাঁহার আশীর্ব্বাদ লইয়া পুনরায় তাঁহারা পুষ্পক রথে উঠিলেন।

এদিকে রাম অযোধ্যায় যাইতেছেন এই সংবাদ লইয়া হনুমান অযোধ্যায় চলিয়া গিয়াছে এবং ভরতকে সংবাদ দিয়াছে। ভরত পূর্ব্বেই রামকে অযোধ্যার বন হইতে ফিরাইয়া আনিতে না পারিয়া তাঁহার খড়ম মাথায় করিয়া আনিয়াছেন এবং সেই খড়ম সিংহাসনে রাখিয়া নন্দীগ্রামে থাকিয়া রাজ্য শাসন করিতেছিলেন। এখন রাম আসিতেছেন হনুমানের নিকট এই খবর পাইয়া শত্রুঘ্নের সহিত ও আর আর মন্ত্রী ও পুরোহিত সঙ্গে লইয়া রামের সহিত পথেই দেখা করিতে ও তাঁহাকে আনিতে রওনা হইলেন। রাম ও ভরতের

একত্রে দেখা হইল। ভরত রামকে প্রণাম করিবার পর রাম ভরতকে আশীর্ব্বাদ করিলেন এবং বিভীষণ ও অঙ্গদের সহিত ভরতের পরিচয় করিয়া দিলেন. বলিলেন এই অঙ্গদ বানরের রাজা ও আমার উপকারী এবং এই বিভীষণ রাক্ষসের রাজা ও আমার মিত্র। ভরত তাহাদিগকে খুব মান্য করিলেন। সীতা অনেক দিনের পর শাশুড়ী কৌশল্যা ও সুমিত্রাকে প্রণাম করিয়া আনন্দিত হইলেন। রাম, লক্ষ্মণ, ভরত ও শত্রুঘ্ন চারি ভাই, কৌশল্যা, সুমিত্রা, সীতা ও অন্যান্য সকলে মিলিত হইয়া বড়ই আনন্দিত হইলেন। অনেক দিন পরে সুমিত্রা ও কৌশল্যা রাম লক্ষ্মণকে দেখিয়া যেন আকাশের চাঁদ হাতে পাইলেন। পরে সকলে একত্রে অযোধ্যায় আসিলেন। রাম, লক্ষ্মণ ও সীতাকে দেখিয়া অযোধ্যাবাসীদিগের আনন্দের সীমা থাকিল না। রামের বনে গমন ও রাজা দশরথের মৃত্যুতে প্রজাগণ মরার মত হইয়াছিল, এখন পুনরায় রামকে দেখিয়া তাহারা সে দুঃখ ভুলিয়া গেল, আজ অযোধ্যায় আনন্দের স্রোত বহিতে লাগিল। রাজার মৃত্যুর পর কেহ কোন দিন আনন্দের কাজ করে নাই। আজ সে সকল দুঃখ দূর হইয়া অযোধ্যাবাসিগণের হৃদয় মহা আনন্দে নাচিয়া উঠিল।

রাম বনবাস হইতে ফিরিয়া আসিবার পর, তাঁহার রাজা হইবার উদ্যোগ হইল। ভরত এতদিন রামের আজ্ঞায় রাজ্য রক্ষা করিতেছিলেন, তিনি রাজ্য লইবেন না, রামকে রাজা করিয়া তাঁহার চাকরের ন্যায় থাকিবেন। রামের রাজা হইবার

দিন স্থির হইল এবং নিমন্ত্রণ পাইয়া অনেক বড় বড় রাজা অযোধ্যায় আসিতে লাগিলেন। বিশ্বামিত্র, জাবালি, ভরদ্বাজ

রামের রাজ্যাভিষেক।

ও আর আর মুনিরা অযোধ্যার রাজসভায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বশিষ্ঠ রঘুবংশের গুরু, তিনি অন্যান্য মুনি, রাজা ও ব্রাহ্মণদিগের মত লইয়া রামকে অযোধ্যার রাজসিংহাসনে বসাইয়া তাঁহার মাথায় রাজমুকুট ও হাতে রাজদণ্ড দিলেন। স্বর্গ হইতে রাজসভায় পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল। রাম রাজা হইয়া দরিদ্রদিগকে অর্থ দিলেন, ব্রাহ্মণদিগকে স্বর্ণ ও গরু দান করিলেন, নগরবাসিগণকে পরিতোষপূর্ব্বক আহার করাইলেন, যে যাহা চাহিয়াছিল সে তাহাই পাইল। অযোধ্যায় কিছু দিন পর্য্যন্ত মহা আমোদ চলিল।

———

উত্তরাকাণ্ড।

রাজা দশরথের শান্তা নাম্নী পূর্ব্বে একটী মেয়ে হইয়াছিল। লোমপাদ রাজা দশরথের বড় বন্ধু ছিলেন। তাঁহার পুত্র ছিল না এজন্য দশরথ শান্তা কন্যা লোমপাদকে দান করেন। পরে যখন রাজা দশরথ বন হইতে ঋষ্যশৃঙ্গ মুনিকে আনিয়া যজ্ঞ করেন ও সেই যজ্ঞ শেষ হইলে লোমপাদ সন্তুষ্ট হইয়া শান্তার সহিত ঋষ্যশৃঙ্গের বিবাহ দেন, এইজন্য ঋষ্যশৃঙ্গমুনি রাজা দশরথের জামাই হইয়াছিলেন। ঋষ্যশৃঙ্গ রাম রাজা হইবার পর একটী যজ্ঞ আরম্ভ করিয়াছিলেন এবং সেই যজ্ঞে অযোধ্যার সকলকে নিমন্ত্রণ করিয়া পাঠাইয়াছিলেন এবং শান্তা ও সকলকে যাইবার জন্য একান্ত অনুরোধ করিয়াছিলেন। তাহাঁদের অনুরোধ রক্ষা করিবার জন্য কৌশল্যা ও অন্যান্য রাণীরা পুরোহিত বশিষ্ঠের সহিত শান্তার বাড়ী গিয়াছিলেন, অযোধ্যায় কেবল রাম লক্ষ্মণ সীতা ছিলেন, সীতার ছেলে হইবে বলিয়া তাহাদের যাওয়া হয় নাই। রামের রাজা হইবার সময় সীতার বাপ জনক, ও আর আর আত্মীয় সকল আসিয়াছিলেন, তাঁহারাও সম্প্রতি চলিয়া গিয়াছেন, আপনার লোককে অনেকদিন পরে দেখিতে পাইলেও তার পর তাঁহারা চলিয়া গেলে সকলেরই মনে দুঃখ হয়। সীতার মনেও সেইরূপ দুঃখ

হইয়াছিল, রাম তাঁহাকে নানারকম কথা বলিয়া শান্ত করিতে-ছিলেন ও অবশেষে রাম ও সীতার বনবাসের ছবি আনিয়া সীতাকে তাহাই দেখাইতেছিলেন! সীতা সেই ছবিতে পঞ্চবটী, গোদাবরী, ভরদ্বাজ মুনির আশ্রম, গুহক চণ্ডালের বাড়ী ও সরযূ সবই দেখিতে লাগিলেন, এই সকল দেখিয়া তাঁহার মনে বড়ই আমোদ হইল এবং রামকে বলিলেন, এই সকল স্থানে অনেক দিন ছিলাম আর একবার আমার এই সকল স্থান ও মুনিদের আশ্রম দেখিতে ইচ্ছা হইতেছে। রাম বলিলেন, তাহাই হইবে। তারপর কিছুক্ষণ এই ছবি দেখিতে দেখিতে সীতা ঘুমাইলেন।

রাম রাজা হইবার পর রাজ্যের নিয়ম অনুসারে রাজত্ব করিতেছিলেন, কিন্তু তাঁহার শাসনে প্রজাগণ সন্তুষ্ট আছে কি না ইহা জানিবার জন্য,রামচন্দ্র দুর্ম্মুখ নামে একজন বিশ্বাসী ভৃত্যকে গোপনে খোঁজ লইবার জন্য নিযুক্ত করিয়াছিলেন। প্রজাগণের কোন কারণে, রাজার প্রতি অসন্তোষ দেখিলে দুর্ম্মুখ আসিয়া রামকে তাহার সংবাদ দিত। রামও প্রজারা যাহাতে অসুখী না হয় এইরূপ কাজ করিতেন। রাম এইরূপ সকল বিষয়ই, গোপনে খবর লইতেন, ও যাহাতে প্রজারা সুখে বাস করিতে পারে তাহাই করিতেন। রামের রাজত্বে প্রজারা বড়ই সুখে বাস করিত। একদিন অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত রামচন্দ্র সীতাকে লইয়া প্রমোদগৃহে নানা প্রকার ক্রীড়া কৌতুক দেখাইতেছিলেন। কখন বা দেয়ালের ছবিগুলি সীতাকে

দেখাইতে ছিলেন। কখন বা গৃহের বাহিরে আসিয়া আলোক-মালায় সজ্জিত পুষ্পোদ্যান দেখাইতেছিলেন। আবার কখন বা সীতার মুখের দিকে তাকাইয়া, অতৃপ্তনয়নে তাঁহার মুখচন্দ্রমা নিরীক্ষণ করিতেছিলেন। এইরূপে সীতা ক্লান্ত হইয়া পড়িলে, তাঁহারা গৃহের অভ্যন্তরে আসিয়া বসিলেন, এবং নর্ত্তকীগণের সুমধুর সংগীত শুনিতে লাগিলেন। অধিক রাত্রি হওয়াতে সীতার নিদ্রাকর্ষণ হইতেছে, বুঝিতে পারিয়া রামচন্দ্র সীতাকে তাঁহার নিকটে শুইতে বলিলেন। সীতাও রামচন্দ্রের আদেশ পাইয়া, সেখানকার সুচারু কারুকার্য্যখচিত মখমলের উপর শুইয়া নিদ্রিতা হইয়া পড়িলেন। এমন সময় দুর্ম্মুখ আসিয়া তথায় উপস্থিত হইল। দুর্ম্মুখকে দেখিয়া রামচন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন, দুর্ম্মুখ! বল তুমি গোপনে প্রজাদিগের মধ্যে অনুসন্ধান করিয়া আজ কি জানিতে পারিয়াছ। দুর্ম্মুখ বলিল, মহারাজ প্রজারা সকলেই আপনার প্রশংসা করিয়া থাকে। ইহা শুনিয়া রামচন্দ্র বলিলেন, আমি তাহা জিজ্ঞাসা করিতেছি না। যদি আমার কোনও দোষের কথা শুনিয়া থাক, তাহাই বল। প্রজারা আমাকে কোনও দোষ দিতে না পারে তাহা করিব। দুর্ম্মুখ অতি দুঃখের সহিত, গোপনে রামচন্দ্রকে বলিলেন, মা সীতার সম্বন্ধে আমি আজ প্রজাদিগের মধ্যে একটী গুরুতর কথা শুনিলাম, তাহা আমার বলিতে ভয় হইতেছে। রামচন্দ্র বলিলেন তোমার কোন ভয় নাই; যাহা শুনিয়াছ বল। দুর্ম্মুখ বলিল, মা সীতা অনেক দিন লঙ্কায় রাবণের ঘরে ছিলেন, এজন্য কেহ কেহ তাঁহার

চরিত্রে কলঙ্ক হইয়াছে এমন বলিতেছে। রাম দুর্ম্মুখের কথা শুনিয়া, মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, লঙ্কায় রাবণ বধের পর অগ্নি পরীক্ষা করিয়া সীতাকে লইয়াছি, অগ্নিদেব ও আর আর দেবতারা সকলে একবাক্যে বলিয়াছেন সীতার চরিত্রে কোনও দোষ নাই। কিন্তু এ সমস্ত ঘটনা সমুদ্রের পারে লঙ্কায় অতি দূরে হইয়াছে, তথায় সে সময় অযোধ্যার কেহ উপস্থিত ছিল না। কাজেই সে অগ্নিপরীক্ষার কথা অযোধ্যার লোকে বিশ্বাস করিবে কেন? আমি জানি সীতার চরিত্রে কোনও দোষ নাই, আমি অযোধ্যার রাজা, প্রজাগণ আমার কোন দোষের কথা প্রকাশ করিতে সাহসী হয় না বলিয়াই তাহারা গোপনে এই সকল বলাবলি করিতেছে। আমার পূর্ব্বপুরুষগণ প্রাণ পর্য্যন্তও পণ করিয়া প্রজাদিগকে সন্তুষ্ট করিয়া গিয়াছেন। আমার পিতা দশরথ, আমাকেও বনবাসে পাঠাইয়া সত্যরক্ষা এবং অপত্য-নির্ব্বিশেষে প্রজা পালন করিয়াছিলেন। প্রজাগণকে সন্তুষ্ট রাখাই রাজার প্রধান ধর্ম্ম। সেই ধর্ম্ম রক্ষা করিতে না পারিলে এজন্মে নিন্দা ও পরজন্মে নরক ভোগ হয়। অতএব প্রজা সন্তুষ্ট রাখিবার জন্য সীতাকে আমি পরিত্যাগ করিব। বিনা দোষে তাহাকে বনবাস দেওয়া যদিও অন্যায় হইল, কিন্তু রাজ্যের সমস্ত প্রজাদিগকে অসন্তুষ্ট করিয়া, সীতাকে গৃহে রাখিলে, আমাকে অধর্ম্মে পতিত হইতে হইবে এবং নরকে যাইতে হইবে।

রামচন্দ্র মনে মনে এইরূপ স্থির করিয়া লক্ষ্মণকে ডাকিয়া আনিতে দুর্ম্মুখকে আদেশ করিলেন। তৎক্ষণাৎ লক্ষ্মণ আসিয়া

উপস্থিত হইল। লক্ষ্মণকে দেখিয়া রাম বলিলেন ভাই লক্ষ্মণ! সীতা একবার তপোবন ও মুনিদিগের আশ্রম দেখিতে চাহিয়াছেন, তুমি রথে করিয়া সীতাকে তপোবনে লইয়া যাও এবং তথায় তাঁহাকে বনবাস দিয়া আইস। সীতার কোনও দোষ নাই কিন্তু আমি ধর্ম্মানুসারে রাজ্য পালন করিবার জন্যই সীতাকে বনবাস দিতেছি।

লক্ষ্মণ চিরকালই রামের ভৃত্যের ন্যায় আজ্ঞাকারী আছেন। রামের এই কথা শুনিয়া তাঁহার মনে বড়ই কষ্ট হইল, কিন্তু দাদার সম্মুখে কিছুই বলিতে পারিলেন না। সুমন্ত্র তাঁহাদের সারথি ছিল, তখনই তাহাকে রথ আনিতে বলা হইল। সুমন্ত্র রথ সাজাইয়া আনিলে, লক্ষ্মণ সীতাকে বন দেখাইবার কথা বলিয়া তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া রথে উঠিলেন, রথ অযোধ্যার রাজধানী, নগর ও গ্রাম ছাড়াইয়া বনে আসিয়া পৌঁছিল এবং প্রায় বাল্মীকি মুনির আশ্রমের নিকট আসিলে সেই স্থানে সীতাকে বনবাস দিয়া যাইতে হইবে এই ভাবনায় লক্ষ্মণের মনে বড়ই কষ্ট উপস্থিত হইল। তাঁহার মুখ শুকাইয়া আসিতে লাগিল এবং চোক দিয়া জল পড়িতে আরম্ভ হইল। সীতা তাঁহাকে এরূপ দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, লক্ষ্মণ! আজ তোমার এরূপ অবস্থা দেখিতেছি কেন? যদি কোন অমঙ্গল হইয়া থাকে বল, আমার মন বড়ই অস্থির হইয়াছে। লক্ষ্মণ সীতার কথায় কান্দিতে কান্দিতে রাম যাহা যাহা বলিয়া দিয়াছিলেন তাহা বলিলেন। বনবাসের কথা শুনিয়া সীতার

ভয় হইল, কিন্তু রাম যাহা বলিয়া দিয়াছেন তাহা অবশ্যই পালন করিতে হইবে,মনে করিয়া বলিলেন, আমার অদৃষ্টে যাহা থাকে তাহা অবশ্যই হইবে,আমি যতদিন বাঁচিয়া থাকিব,তাঁহার আজ্ঞা পালন করিব, তুমিও তাঁহার কথামত কার্য্য করিবে, অতএব আর বেশী দূর যাইবার দরকার নাই। এইখানে রথ রাখ, আমি নিজেই বনবাসে যাইতেছি।' তুমি আমার জন্য শোক করিও না এবং দেখিও যেন রামচন্দ্রের কোন বিপদ্ না ঘটে, আমার ভাগ্যে যাহা হয় হউক, তাহাতে দুঃখ নাই, পরমেশ্বর যেন তাঁহাকে সর্ব্বদা রক্ষা করেন। এই সকল কথা বলিয়া সীতা রথ হইতে নামিলেন, লক্ষ্মণও তাঁহার সহিত নামিলেন। তার পর সীতা বনের মধ্যে গেলেন। তখন লক্ষ্মণ ও সুমন্ত্র কান্দিতে কান্দিতে রথে উঠিলেন।

এইরূপে সীতাকে বনবাস দিয়া লক্ষ্মণ অযোধ্যায় ফিরিয়া আসিলেন। অযোধ্যার সকল লোকই সীতার বনবাসের কথা শুনিয়া দুঃখিত হইল। কৌশল্যা প্রভৃতি সকলে ঋষ্যশৃঙ্গের যজ্ঞ হইতে ফিরিয়া আসিয়া সীতাকে না দেখিয়াও তাহার বনবাসের সংবাদ শুনিয়া মনে বড়ই কষ্ট পাইলেন। মনের কষ্ট মনেই সহিয়া রহিলেন। রাম রাজা হইয়াছেন, বিনা কারণে কাহাকেও শাস্তি দেন না, বুঝিয়া আর কেহ কোনও কথা বলিতে পারিলেন না।

সীতাকে বনবাস দিয়াও রাম রাজকার্য্য করিতে কখনও অবহেলা করেন নাই। রাজ্যে কোনও অবিচার বা অন্যায় হইলে এবং তাহাতে রাজার ত্রুটি হইলে মহাপাপ হয়। রাম

ধর্ম্ম ও নিয়ম অনুসারে সর্ব্বদাই রাজ্য রক্ষা ও প্রজাদিগকে পালন করিয়া আসিতেছেন, রামের রাজ্যে কোনও অবিচার বা অন্যায় ছিল না এবং কোন প্রজা অকালে মরিত না, সকলেই বৃদ্ধ হইয়া মরিবার উপযুক্ত সময়ে মরিত। একদিন একটী ব্রাহ্মণ তাহার একটী ছোট মরা ছেলে লইয়া রাজার দরজায় আসিল এবং কান্দিতে কান্দিতে বলিতে লাগিল আমার এই ছোট ছেলে অকালে কেন মরিল? ভাল রাজার রাজ্যে বাস করিলে কেহ অকালে মরে না, আমরা এই রাম রাজার রাজ্যে বাস করিতেছি, নিশ্চয়ই রাজার পাপে আমার এই ছেলে অকালে মরিয়াছে, রাজ্যের মধ্যে কোনও রকমের অধর্ম্ম হইতেছে, রাজা সেই অধর্ম্ম দূর করিয়া আমার ছেলে বাঁচাইয়া দাও।

প্রজার কান্না শুনিয়া রামের মন গলিয়া গেল। তিনি আর থাকিতে পারিলেন না, আমার পাপেই অকালে প্রজা মরিতেছে,

শম্বুক ঋষি।

ইহা মহাপাপ মনে করিয়া তৎক্ষণাৎ অস্ত্র শস্ত্র লইয়া রাজ্য মধ্যে ঘুরিয়া দেখিবার জন্য বাহির হইলেন। এবং দিন রাত বিশ্রাম না

করিয়া গ্রামে গ্রামে, বনে বনে ও পাহাড়ে পাহাড়ে ঘুরিতে আরম্ভ করিলেন, ঘুরিতে ঘুরিতে জনস্থান নামে একটী বনে উপস্থিত হইলেন ও তথায় দেখিলেন শম্বুক নামে একটী শূদ্র তপস্যা করিতেছে। শূদ্রের তপস্যা করা বড় পাপের কাজ, ব্রাহ্মণ ভিন্ন আর কেহ তপস্যা করিতে পারে না। করিলে অধর্ম্ম হয়, এবং বুঝিলেন এই অধর্ম্মেই ব্রাহ্মণের ছেলে অকালে মরিয়াছে। রাম তখনই তরোয়াল বাহির করিয়া শম্বুকের মাথা কাটিয়া ফেলিলেন এবং তৎক্ষণাৎ ব্রাহ্মণের ছেলে বাঁচিয়া উঠিল ও শম্বুকের শরীর হইতে একজন সুন্দর পুরুষ বাহির হইল ও রামকে প্রণাম করিয়া বলিল, তোমার আশীর্ব্বাদে আমি স্বর্গে চলিলাম ও এই ব্রাহ্মণের ছেলে বাঁচিল। আমার জন্য ঐ স্বর্গ হইতে রথ আসিতেছে, বলিতে বলিতে স্বর্গ হইতে রথ আসিল ও শম্বুক তাহাতে চড়িয়া স্বর্গে চলিয়া গেল। শম্বুকের মরা শরীর ও কাটামুণ্ড তথায় পড়িয়া রহিল।

রাম বনবাসে আসিয়া এই স্থানে বাস করিয়াছিলেন। তার পর এবার বহুদিন পরে পুনরায় দৈবাৎ এখানে আসিয়া তাঁহার সেই সব বনবাসের কথা মনে উঠিল। পূর্ব্বে যে পাহাড়ে গাছ ও নদী দেখিয়াছিলেন এখনও সেগুলি সেই ভাবে সেই স্থানে রহিয়াছে, কেবল কোন কোনও স্থানে অনেক নূতন গাছ জন্মিয়াছে ও কোথাও বা ২।৪টী গাছ মরিয়া গিয়াছে। যে স্থানে তমসা নদী পার হইয়াছিলেন, সে স্থান দেখিলেন এবং এই সব দেখিয়া তাঁহার মনে বড় আমোদ হইতে

লাগিল এবং যত দেখেন ততই দেখিবার ইচ্ছা বাড়িতে আরম্ভ হইল। একটী একটী করিয়া অনেক স্থানে ঘুরিতে লাগিলেন। বনবাসের সময় সীতা সঙ্গে ছিল ও তাহাকে কত নূতন নূতন স্থান ও নদী দেখাইয়াছিলেন। এবার সীতা সঙ্গে নাই এজন্য রামের কষ্টবোধ হইতে আরম্ভ হইল। এবং ক্রমে ক্রমে সীতার সমস্ত কথা মনে হওয়ায় রাম একেবারেই কাতর হইয়া পড়িলেন, সীতার জন্য অনেকক্ষণ কান্দিয়া শেষে রাম রথে উঠিয়া অযোধ্যায় ফিরিয়া আসিলেন।

পূর্ব্বকালে রাজারা বড় বড় যজ্ঞ করিতেন, অনেক মুনি ঋষিরা তাঁহাদের রাজধানীতে আসিয়া যজ্ঞ কার্য্য সমাধা করিতেন। তাহাতে দেবতারা সন্তুষ্ট হইতেন এজন্য সেই রাজার রাজ্যে সুসময়ে বৃষ্টি হইত এবং সকল রকম উৎপাত ও পীড়া দূরে যাইত। যাহারা ভিক্ষা করিয়া খায় তাহারা যজ্ঞের সময় অনেক খাইতে পাইত, কাপড় ও পয়সা পাইয়া রাজাকে আশীর্ব্বাদ করিত। যজ্ঞ করিলে ধর্ম্ম হয় ও মন পবিত্র হয়, সীতাকে বনবাস দিয়া রাম বড়ই দুঃখে কাল কাটাইতেছেন, কিছুতেই তাঁহার মন আনন্দিত হয় না এজন্য তিনি অশ্বমেধ যজ্ঞ করিবেন মনে মনে স্থির করিলেন।

রাম তাঁহাদের গুরু, বশিষ্ঠ দেবকে যজ্ঞের সমস্ত কথা জিজ্ঞাসা করিলেন এবং তাঁহার পরামর্শ মতে অশ্বমেধ যজ্ঞের আয়োজন করিলেন। রামের যজ্ঞে ভরদ্বাজ, জাবালি, বশিষ্ঠ ও অন্যান্য মুনিরা আসিলেন, দেশ বিদেশ হইতে নিমন্ত্রণ করিয়া

অনেক বড় বড় রাজা, বহুদূর হইতে ব্রাহ্মণ ও ভিক্ষুক আসিয়া অযোধ্যার রাজধানী পূরিয়া গেল, রাজা ও তাঁহার কার্য্যকারকগণ সকলকে উপযুক্ত যত্ন ও সম্মান করিতে লাগিলেন। অযোধ্যার রাজধানীতে একটা মহা ধূম পড়িয়া গেল। সকলেরই মনে এক নূতন আনন্দ। সকলেই নানা কাজে ব্যস্ত। মুনি ঋষিরা যজ্ঞের প্রকাণ্ড আগুনের কুণ্ড করিয়া তাহাতে ঘৃতের আহুতি দিতেছেন, চারি দিক্ হইতে মন্ত্রের শব্দ উঠিতেছে, ঘৃত ও নানা রকম সুগন্ধি জিনিস পুড়িতেছে তাহার গন্ধে চারিদিক্ আমোদিত করিয়া তুলিতেছে। রাম, লক্ষ্মণ, ভরত ও শত্রুঘ্ন চারি ভ্রাতা সাদা পোষাক পরিয়া যজ্ঞের নিকট উপস্থিত আছেন। পুরোহিতেরা তাঁহাদের নাম উচ্চারণ করিয়া অগ্নিতে আহুতি দিতেছেন এবং দেবতার নিকট তাঁহাদের মঙ্গল প্রার্থনা করিতেছেন। অশ্বমেধ যজ্ঞ ঘোড়া ভিন্ন হয় না, শেষে ঘোড়া আনাইয়া যজ্ঞে উৎসর্গ করা হইল এবং সেই ঘোড়ার কপালে জয়পতাকা লিখিয়া ছাড়িয়া দিলেন। সেই ঘোড়া একবৎসর ধরিয়া সমস্ত স্থানে ইচ্ছামত ঘুরিয়া আসিলে পরে তাহাকে বলি দেওয়া হইবে। ঘোড়া কেহ ধরিয়া না লয়, কিংবা কোন জন্তুতে, বাঘ ভাল্লুকে মারিয়া না ফেলে এজন্য লক্ষ্মণ অনেক সৈন্য সামন্ত সঙ্গে লইয়া ঘোড়ার সঙ্গে সঙ্গে যাত্রা করিলেন। ঘোড়াকে কেহ ধরিল না, বা তাহাকে ফিরাইল না, ঘোড়ার যে দিকে ইচ্ছা যায় সৈন্যগণও তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করে। যদি কোন রাজা বা বীর ঘোড়া ধরে,

তবে তাহার সহিত যুদ্ধ করিয়া তাহাকে পরাস্ত করিবে ও ঘোড়া খালাস করিয়া লইবে। ঘোড়া ক্রমে ঘুরিতে ঘুরিতে এক রাজার রাজ্য ছাড়িয়া অপর রাজার রাজ্যে উপস্থিত হইল। এইরূপ দেশ দেশান্তর নদ নদী পার হইয়া চলিতে আরম্ভ করিল। সৈন্যগণও সর্ব্বদা সাবধান হইয়া তাহার পাছে পাছে চলিতে লাগিল। মধ্যে কেহ কেহ একবার ঘোড়া ধরিল ও তাহার সহিত তুমুল যুদ্ধ বাধিল। শেষ যুদ্ধে হারিয়া ঘোড়া ছাড়িয়া দিল ও দল বল সৈন্য লইয়া লক্ষ্মণের সঙ্গে মিশিয়া চলিতে আরম্ভ করিল। কোনও রাজা ঘোড়ার কপালের লেখা "রামের অশ্বমেধের ঘোড়া" এই কথা পড়িয়াই লক্ষ্মণের সহিত নিজের সৈন্য লইয়া আসিয়া মিলিল, এবং ঘোড়ার সঙ্গে সঙ্গে চলিতে আরম্ভ করিল। এইরূপে লক্ষ্মণের সৈন্য ক্রমে বাড়িতে আরম্ভ হইল।

লক্ষ্মণ সীতাকে বনবাস দিয়া আসিবার পর, সীতা মনের দুঃখে ও রামের জন্য কষ্টে কাঁদিতে আরম্ভ করিলেন, এবং কান্দিতে কান্দিতে একবারে অজ্ঞান হইয়া পড়িলেন। কিছুক্ষণ সেই ভাবে যাইবার পর পুনরায় তাঁহার জ্ঞান হইল এবং তিনি কি জন্য এখানে আসিলেন মনে হওয়াতেই আবার কান্দিতে লাগিলেন। এইরূপে সন্ধ্যা হইয়া আসিল, তপোবনের নিকটে এইরূপ স্ত্রীলোকের কান্নার শব্দ শুনিয়া বাল্মীকি মুনি সান্ধ্য উপাসনা করিয়া যাইবার সময় সীতার নিকটে আসিলেন। সীতা রাজার কন্যা ও রাজার মহিষী তাহার

আকার, ভাব এবং উচ্চৈঃস্বরে কান্না দেখিয়া মুনির মন দয়ায় গলিয়া গেল। বাল্মীকি মুনি অতি যত্নের সহিত সীতাকে সান্ত্বনা করিয়া তাঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন এবং সমস্ত পরিচয় জানিয়া বড় দুঃখিত হইলেন। তিনি সীতাকে সান্ত্বনা করিয়া তাঁহার নিজের কুড়ে ঘরে লইয়া গেলেন ও বনের ফল-মূল খাইতে দিলেন। সীতা রাজার বধূ হইলেও স্বামীর সহিত একবার অনেকদিন বনে বাস করিয়াছেন, সুতরাং বনের ফলমূল খাওয়া তাঁহার অভ্যাস আছে। সেই কষ্টের সময় মুনির যত্ন ও তাঁহার পাতার কুড়ের আশ্রয়, সীতার নিকট স্বর্গ বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। সীতার ছেলে হইবে ও সেই ছেলে রঘুবংশের রাজা হইবে, জানিয়া বাল্মীকি মুনি সীতার আরও যত্ন ও শুশ্রূষা করিতে আরম্ভ করিলেন। সীতাও ক্রমে শোক ভুলিয়া মুনির আশ্রমেই, আপন বাপের বাড়ীর ন্যায় বাস করিতে লাগিলেন। সীতার প্রথম বার বনবাসের সময় লঙ্কার অশোকবনে মধ্যে মধ্যে বিভীষণের স্ত্রী সরমা আসিয়া সীতার সহিত কথা বার্ত্তা বলিতেন, এখন ঋষিদিগের স্ত্রী ও তাহাদের কন্যারা সীতাকে পাইয়া সর্ব্বদাই তাঁহার নিকট যাইতেন ও নানা প্রকার কথাবার্ত্তা বলিতেন। ইহাতে সীতা দুঃখ অনেক ভুলিয়া গেলেন। মুনির জন্য সীতা ফল কুড়াইয়া রাখিতেন, জল আনিতেন ও মুনি তপস্যা হইতে ফিরিয়া আসিলে ফল ও জল খাইতে দিতেন। এবং মুনির খাওয়ার পর যাহা কিছু পড়িয়া থাকিত, তাহাই খাইয়া

নিজে প্রাণরক্ষা করিতেন। অবসর হইলে মুনির নিকট ধর্ম্মবিষয়ে অনেক কথা ও রঘুবংশের রাজাদিগের গল্প শুনিতেন। শেষে মুনির জন্য পাতার বিছানা তৈয়ার করিয়া দিয়া নিজে আর একটী পাতার বিছানায় শুইয়া রাত্রি কাটাইতেন।

এই প্রকারে কিছু দিন চলিয়া গেল, তার পর উপযুক্ত সময়ে সীতার দুইটী ছেলে হইল। বাল্মীকি তাহাদের নাম কুশ ও লব রাখিলেন এবং ক্ষত্রিয়ের বিধান অনুসারে তাহাদের সমস্ত কার্য্য করিলেন। কুশ ও লব রাজার ছেলে, তাহাদের সেইরূপই শরীর ও গায়ের রং হইল। ক্রমে ইহারা বড় হইলে সিংহশাবকের ন্যায় তাহাদের বল ও বিক্রম বাড়িতে লাগিল। একটু বড় হইলেই বাল্মীকি তাহাদের দুই ভাইকে লেখা পড়া শিখাইতে আরম্ভ করিলেন। নীতি বিদ্যা ও যুদ্ধ বিদ্যাই তাহারা অগ্রে শিখিতে লাগিল। ধনুক, তীর ও অস্ত্র শস্ত্রে তাহারা বড় নিপুণ হইয়া উঠিল। কিন্তু তাহারা যে রাজার ছেলে ও কে তাহাদের পিতা তাহা কিছুই জানিত না। কেবলমাত্র সীতাকে মা বলিয়া জানিত ও বাল্মীকিকে মুনি ঠাকুর বলিয়া জানিত। সেই আশ্রমে ও তাহার চারিদিকের বনের মধ্যে দুই ভাই আর আর মুনিবালকদিগের সহিত মিলিয়া খেলা করিয়া বেড়াইত। আর মুনির নিকট বিদ্যা শিক্ষা করিত। কুশ ও লবের নিকট তাহার চিহ্ন স্বরূপ সর্ব্বদাই ধনুকবাণ, হরিণের চামড়া ও বট গাছের লাঠি থাকিত। এ সব ক্ষত্রিয়দিগের ধারণ করিবার নিয়ম আছে।

এদিকে রামের অশ্বমেধের ঘোড়া ঘুরিতে ঘুরিতে বাল্মীকির তপোবনে আসিয়া প্রবেশ করিল। মুনিদিগের ছেলেরা কখনও ঘোড়া দেখে নাই। তাহারা এই এক নূতন জন্তু দেখিয়া একেবারে অবাক্ হইল এবং কুশ ও লবকে ডাকিয়া আনিল। কুশ ও লব আসিয়া দেখিল ইহা একটী নূতন জন্তু কিন্তু তাহারা যুদ্ধ শাস্ত্রে ঘোড়ার কথা পড়িয়াছিল, ঘোড়া দেখিয়াই মনে হইল এটা সেই ঘোড়া হইবে, শাস্ত্রে যেরূপ লেখা আছে এটীও সেইরূপ ঘাস খায়; চারি পা, পাছের দিকে লেজ আছে, ছোট ছোট আমের মত মলত্যাগ করে! এই সব দেখিয়া সকলেরই খুব আমোদ হইল এবং এইরূপ একটা নূতন জন্তু দেখিয়া কুশ ও লব যজ্ঞের ঘোড়াটীকে বাঁধিয়া আনিলেন ও তাহার কপালে লিখিত, জয় পত্র পড়িয়া বুঝিতে পারিলেন এটা রামের অশ্বমেধ যজ্ঞের ঘোড়া। পরে কুশ ও লব সীতার নিকট আসিয়া সমস্ত কথা বলিলেন, তাহাদের কথা শুনিয়া সীতা সমস্তই বুঝিতে পারিলেন ও রামের যজ্ঞের ঘোড়া কুশ ও লব বাঁধিয়াছে; ইহার পর পিতা ও পুত্রের যুদ্ধ হইবে এই ভাবিয়া বড় ভয় পাইলেন। কিন্তু রাম যে কুশ ও লবের পিতা তাহা বলিতে তাঁহার সাহস হইল না। কেবল মাত্র পরমেশ্বরকে ডাকিতে আরম্ভ করিলেন ও যাহাতে পিতা পুত্রের যুদ্ধ না হয়, ও কাহারও অমঙ্গল না হয়, তাহাই একান্ত মনে পরমেশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিতে লাগিলেন।

মুনির আশ্রমে বালকেরা ঘোড়া বাঁধিয়াছে শুনিয়া যাহারা

ঘোড়ার সহিত আসিয়াছিল তাহারা সহজ ভাবে আশ্রমে আসিয়া ঘোড়া চাহিল কিন্তু কুশ ও লব রাজার ছেলে, তাহারা যুদ্ধ শিখিয়াছে, ঘোড়ার কপালে লেখা ছিল যদি কেহ বীর থাক তবে ঘোড়া ধরিও। ইহা পড়িয়া তাহাদের বড়ই রাগ হইয়াছে, তাহারা যুদ্ধ না করিয়া ঘোড়া ফেরত দিবে না বলিল। ক্রমে তাহাদের সহিত রামের লোক জনের যুদ্ধ বাধিয়া উঠিল, কিন্তু যুদ্ধে কুশ ও লবের সম্মুখে কেহই দাঁড়াইতে পারে না, কুশ ও লব দুই ভাই এমন বাণ ছাড়িতে আরম্ভ করিল যে, বিপক্ষের সকল অস্ত্র শস্ত্র কাটিয়া যাইতে লাগিল ও বাণের ঘায়ে তাহারা প্রাণ লইয়া পলাইবার পথ পাইল না। মুনি-কুমারদিগের এইরূপ ভয়ানক যুদ্ধে রামের সৈন্যেরা অবাক্ হইয়া গেল ও বলাবলি করিতে লাগিল যে এত দেশ ঘুরিলাম ও কত জায়গায় যুদ্ধ করিলাম, কিন্তু ছোট ছেলে দুইটার মত বীর ত আমরা কেহ কখনও দেখি নাই, ইহারা ভাই মন্ত্র দিয়া যুদ্ধ করে, মন্ত্রের কাছে আর আমাদের বাহুবল কিছুই নয়!

ক্রমে ক্রমে রামের আর আর সৈন্যেরা সকলে হারিয়া গেলে, তার পর লক্ষ্মণের ছেলে চন্দ্রকেতু আসিয়া বড় ভয়ানক যুদ্ধ করিতে আরম্ভ করিল। চন্দ্রকেতু বেশ যুদ্ধ শিখিয়াছিল, ছেলে মানুষ হইলেও সহজে তাহাকে কেহ হারাইতে পারে না। এ দিকে কুশ ও লব দুই ভাই পাহাড়ের মত অচল অটলভাবে দাঁড়াইয়া অনবরত যুদ্ধে বাণ মারিতেছে।

কুশ লব ও চন্দ্রকেতুর যুদ্ধ।

দুই পক্ষের যুদ্ধ ক্রমেই ঘোরতর হইয়া উঠিল, সৈন্য সকল একেবারে অস্থির হইয়া উঠিল আর কেহ দাঁড়াইতে পারে না। সকলেই প্রাণভয়ে পালাই পালাই হইয়াছে। এমন সময় রামের রথ আসিয়া যুদ্ধের জায়গায় উপস্থিত হইল! কুশ ও লব পূর্ব্বে কখনও রামকে দেখে নাই, এরূপ মহাপুরুষকে দেখিয়া তাহাদের মনে বড়ই একটা আনন্দ উপস্থিত হইল।

পিতা পুত্রে দেখা শুনা নাই, কোন রকমে জানা শুনাও নাই, তবুও তাহাদের এই প্রথম দেখা দেখিতে কুশ ও লবের মনে ভক্তিভাব আসিয়া উপস্থিত হইল। কুশ ও লবকে দেখিয়াও রামের মনে এক স্নেহের ভাব আসিতে লাগিল, উভয়ের মধ্যে কোন জানা শুনা না থাকিলেও উভয়ের মন যেন গোপনে বলিয়া দিতেছে তোমরা তোমাদের। কিন্তু কেহই মুখে তাহা প্রকাশ করিতে পারিতেছে না।

রাম, কুশ ও লব সকলেই এক জায়গায় মিলিত হইয়াছেন। কিন্তু কপালের দোষে কেহ কাহাকেও জানিতে পারিতেছেন না। চন্দ্রকেতুর সহিত কুশ ও লবের যে যুদ্ধ বাঁধিয়াছিল রামের আসাতে সে যুদ্ধ তখনই থামিয়া গেল। তখন আর বাণ কাহারও ছুঁড়িবার ক্ষমতা রহিল না, সকলেই যেন জড়ের মত হইয়া রামের দিকে তাকাইয়া রহিল।

তার পর কুশ ও লব আর যুদ্ধ করিলেন না। এবং রামের বিলক্ষণ সম্মান করিলেন ও যজ্ঞের ঘোড়া ছাড়িয়া দিলেন। এইরূপে সমস্ত দেশ ঘুরিয়া ঘোড়া অযোধ্যায় ফিরিয়া গেল। এইবার রামের অশ্বমেধ যজ্ঞ শেষ হইবে। সমস্ত দেশের রাজা, প্রজা, ব্রাহ্মণ, ভিক্ষুক, মুনি ঋষি সকলেরই নিমন্ত্রণ হইয়াছে এবং রামের আদেশমত লক্ষ্মণ নিজে উপস্থিত থাকিয়া দেখিতে-ছেন, যাহাতে সকলে শান্তভাবে নিজে নিজের জায়গায় বসিয়া যজ্ঞ দেখিতে পারেন এই সব কাজে একটা মহাধূম পড়িয়াছে। আজ সকলেরই আনন্দের অবধি নাই। দেবতারা সকলে যে যাহার রথে চড়িয়া যজ্ঞস্থানে আসিলেন—ইন্দ্র, চন্দ্র, কুবের, যম, বরুণ, বায়ু আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। ঋষিদিগের মধ্যে নারদ, দেবল, কপিল, কশ্যপ প্রভৃতি বশিষ্ঠ জাবালি, বামদেব, ব্যাস ও আর আর সকলে ক্রমে যজ্ঞে আসিতেছেন। বাল্মীকি নিজে যে রামায়ণ লিখিয়াছেন যত্নের সহিত তাহা কুশ ও লবকে শিখাইয়াছেন। সেই সকল শ্লোক রামের যজ্ঞস্থানে গান করিবার জন্য তাহাদিগের দুই ভাইকে সঙ্গে লইয়া

যজ্ঞে আসিলেন। লক্ষ্মণ তাঁহাদিগকে বিশেষ সম্মান করিয়া বসাইলেন। চারি দিকে ব্রাহ্মণ ও পুরোহিতদিগের মুখ হইতে বেদের শব্দ উঠিতেছে, অগ্নিতে নানা রকমের সুগন্ধি দ্রব্য পুড়িতেছে ও তাহার সুন্দর গন্ধে চারিদিক আমোদিত হইতেছে। রাম দেবতা মুনি ও ব্রাহ্মণদিগের অনুমতি লইয়া সিংহাসনে বসিয়া আছেন।

কিছুক্ষণ পরে কুশ ও লব বাল্মীকির অনুমতি পাইয়া সভায়

যজ্ঞে সভায় কুশ ও লবের রামায়ণ গান।

উঠিয়া দাঁড়াইল ও দুই ভাই সমান সুরে রামায়ণ গান করিতে আরম্ভ করিল। ক্রমে রামের কীর্ত্তি শুনিয়া সকলে মোহিত হইয়া গেল। রামও চুপ করিয়া এক মনে নিজের ইতিহাস শুনিতে লাগিলেন। কুশ ও লবের রামায়ণ গান শেষ হইল ও যজ্ঞের আর আর যাহা কাজ ছিল তাহাও সব সমাধা হইয়া গেল।

তার পর বাল্মীকি মুনি রামের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া বলিলেন যে সীতাকে বনবাস দিবার পর হইতে তিনি তাঁহার আশ্রমে আছেন এবং কুশ ও লব তাঁহার পুত্র। সীতার শরীরে কোন পাপ নাই। অতএব রাজার আদেশ হইলে সীতা, কুশ ও লবকে সঙ্গে করিয়া রাজসভায় আনিতে পারি। রাম বাল্মীকির কথা শুনিয়া তৎক্ষণাৎ তাহাতে স্বীকৃত হইলেন এবং সীতাকে রাজসভায় আনিতে বলিলেন।

বাল্মাকি রামের আদেশ পাইয়া সীতা, কুশ ও লবকে সঙ্গে লইয়া রাজসভায় উপস্থিত হইলেন। সীতা মনের দুঃখে ও লজ্জায় একেবারে কাতর হইয়া, মাথা নীচু করিয়া ধীরে ধীরে মুনির সহিত রাজসভায় প্রবেশ করিলেন। সীতাকে দেখিয়া সকলেই তাহার অনেক প্রশংসা করিতে লাগিলেন। বাল্মাকি বলিলেন সীতা পতিব্রতা, সীতার চরিত্রে কোনও পাপ নাই। সীতা কায়মনে রামের পূজা করিয়া থাকেন এবং এই দুই কুমার কুশ ও লব রামের পুত্র, ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম অনুসারে আমি ইহাদের সকল কার্য্য করিয়াছি, এবং শাস্ত্র অধ্যয়ন করাইয়াছি। ইহারা রামের উপযুক্ত পুত্র। রাম, তুমি মিথ্যা লোকের কথায় এরূপ শুদ্ধচরিত্রা ধর্ম্মপত্নীকে বনবাস দিয়াছিলে। এক্ষণে এই সভায় সকলের সম্মুখে নিজের পুত্র দুইটী ও ধর্ম্মপত্নী সাধ্বী সীতাকে গ্রহণ কর।

বাল্মীকির কথা শেষ হইলে দেবতারা সকলেই সীতার অনেক প্রশংসা করিতে লাগিলেন। সীতার চরিত্রে কোনও

দোষ নাই ; ইহা বার বার তাঁহারা বলিতে লাগিলেন। সভার সকল লোকই ভক্তির সহিত সীতার দিকে তাকাইতে লাগিল। স্বর্গ হইতে পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল। চারিদিকে লোকে সীতার প্রশংসা শুনিয়া আনন্দিত হইল এবং বিনা দোষে সীতাকে বনবাস দেওয়া হইয়াছিল জানিয়া দুঃখিত হইল।

কিয়ৎক্ষণ পরে রাম দুঃখে কাতর হইয়া উত্তর করিলেন সীতার চরিত্রে কোন দোষ নাই, সীতা পতিব্রতা তাহা আমি জানি। লঙ্কায় রাবণ বধের পর সীতাকে লইবার সময় তথায় একবার অগ্নিপরীক্ষা করা হইয়াছিল। স্বয়ং অগ্নিদেব ও আর আর দেবতারা সীতার প্রশংসা করিয়াছিলেন। আমিও সন্তুষ্ট মনে সীতাকে গ্রহণ করিয়াছিলাম, কিন্তু সে ঘটনা অতিদূর দেশে, সমুদ্রের পারে, লঙ্কায় হইয়াছিল। এখানকার লোকে তাহা দেখে নাই, এজন্য তাহা তাহারা কিরূপে বিশ্বাস করিবে। এজন্য তাহাদের সীতা সম্বন্ধে নানা রূপ কথা উঠিয়াছিল। প্রজাদিগকে সন্তুষ্ট রাখাই রাজার কার্য্য, আমি তাহাই করিবার জন্য জানিয়া শুনিয়াও, সীতাকে বনবাসে পাঠাইয়াছিলাম। এখনও জানিতেছি সীতার কোন পাপ নাই, কিন্তু তাহা হইলেও প্রজাদিগের বিনা সম্মতিতে কিরূপে সীতাকে গ্রহণ করি। প্রজাপালনই আমার প্রধান ধর্ম্ম, সেই ধর্ম্ম রক্ষা করিবার জন্য, আমার পুর্ব্বপুরুষগণ নিজের প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন ও প্রাণ অপেক্ষা প্রিয়তম পুত্রকে পর্য্যন্তও বনবাস দিয়াছিলেন।

রামের কথা শুনিয়া সীতার মনে দুঃখের অবধি রহিল না।

একান্ত মনের দুঃখে ও কষ্টে ধীরে ধীরে হাত যোড় করিয়া বলিতে লাগিলেন,—হে পৃথিবী ;---আমি যদি যথার্থ পতিব্রতা হই, যদি যথার্থই আমার কোন দোষ না থাকে, তাহা হইলে, তুমি দ্বিখণ্ড হও, আমি তোমার ভিতরে প্রবেশ করি। আমি যদি সর্ব্বদা একপ্রাণে দেবতা বলিয়া রামকে পূজা করিয়া থাকি, তাহা হইলে তুমি দ্বিখণ্ড হও, আমি তোমার ভিতরে প্রবেশ করি। আমি যদি বনবাসের মহা কষ্টে পড়িয়াও এক মুহূর্ত্তের জন্য রামকে ঘৃণা করিয়া না থাকি ও সর্ব্বদাই রামের মঙ্গল কামনা করিয়া থাকি, তাহা হইলে তুমি দ্বিখণ্ড হও, আমি তোমার ভিতরে প্রবেশ করি। আমার যদি দেবতা ও ব্রাহ্মণের প্রতি ভক্তি ও অনুরাগ থাকে এবং ধর্ম্মে মন থাকে তবে তুমি দ্বিখণ্ড হও আমি তোমার ভিতরে প্রবেশ করি।

সীতা মনের দুঃখে এইরূপ বলিলে পরে মহাশব্দে সভার সম্মুখে মাটী ফাটিয়া উঠিল ও একখানি সোনার রথ পাতাল হইতে উঠিল। তাহাতে সীতার মা বসুন্ধরা (পৃথিবী) বসিয়া সীতাকে ডাকিতেছেন, সীতা মায়ের ডাক শুনিয়া রথে মায়ের কোলে যাইয়া বসিলেন ও রথ পুনরায় পৃথিবীর মধ্যে চলিয়া গেল। এই প্রকারে সীতার পাতাল প্রবেশ হইয়া গেল। এবং এই খানেই সীতার সহিত রামের সম্বন্ধ ফুরাইল।

রামের যজ্ঞ শেষ হইলে মুনি ঋষিরা ও অন্যান্য রাজারা

সকলেই অযোধ্যা হইতে চলিয়া গেলেন। রাম বড়ই দুঃখিত মনে অযোধ্যায় বাস করিতে লাগিলেন। লবণ নামে একটি অসুর রামের শত্রু হইয়া উঠিয়াছিল। তাহাকে বিনাশ করিবার নিমিত্ত লক্ষ্মণের পুত্র চন্দ্রকেতুকে পাঠান হইয়াছিল। চন্দ্রকেতু বড় বীর, তিনি অনায়াসেই লবণকে যুদ্ধে মারিয়া অযোধ্যায় ফিরিয়া আসিয়াছিলেন। এক্ষণে চন্দ্রকেতুকে সেই লবণ রাজার রাজ্যে রাজা করিয়া দেওয়া হইল এবং কুশ ও লবকেও অযোধ্যার রাজ্য রক্ষা করিবার জন্য তাহাদিগকে রাজকার্য্য শিক্ষা দিতে লাগিলেন।

কাল নামে ব্রহ্মার একটা পুত্র আছে। জগতের সকল জীবকে তিনি মারিয়া ফেলেন। যাহার কাল পূর্ণ হয়, কাল তাহাকেই গ্রাস করেন। কাল একদিন একটা মুনি-বালকের বেশে অযোধ্যায় আসিলেন ও একটা নির্জ্জন ঘরে রামকে লইয়া যাইয়া বলিলেন, প্রভো! আমি কাল, পৃথিবীর সমস্ত জীবকে মারিয়া ফেলাই আমার কাজ। আপনি বিষ্ণুর অবতার রাবণ বধ করিবার জন্য এখানে রাম অবতার হইয়া আসিয়াছেন। এখন আপনার সে কাজ শেষ হইয়াছে, অতএব এখন যদি ইচ্ছা হয় তবে স্বর্গে চলুন, দেবতারা আপনার অদর্শনে বড় ব্যস্ত হইয়াছেন। এখানে সংসারের মায়া মমতা ভুলিয়া যাউন। প্রাণের ভাই লক্ষ্মণকে পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করুন, ও স্বর্গের কাজে, পুনরায় স্বর্গে চলুন।

রাম কালের কথা শুনিয়া সকলই বুঝিলেন ও স্বর্গে

যাইবার জন্য স্বীকার করিলেন। তার পর কাল রামের নিকটে বিদায় লইয়া স্বর্গে চলিয়া গেলেন। কালের সহিত রামের কথাবার্ত্তা হইবার সময় অপর কেহ তথায় প্রবেশ করিতে না পারে এজন্য লক্ষ্মণ নিজে সেই ঘরের দরজা রক্ষা করিতেছিলেন, এজন্য লক্ষ্মণ, রাম ও কালের সমস্ত কথাবার্ত্তা শুনিতে পাইয়াছিলেন।

কাল রামের নিকট হইতে বিদায় হইয়া যাইলে, তাহার পর হইতেই রাম প্রাণের ভাই লক্ষ্মণকে কিরূপে পরিত্যাগ করিবেন, ইহা ভাবিয়া বড়ই দুঃখের সহিত কাল কাটাইতে লাগিলেন। সর্ব্বদাই দুঃখে তাঁহার মুখ মলিন থাকিত কোনও কাজেই আর উৎসাহ বা উদ্যোগ দেখাইতেন না। ক্রমেই মুখের ভাব মলিন হইয়া আসিতে লাগিল। রামের এই প্রকার অবস্থা দেখিয়া লক্ষ্মণ সকলই বুঝিতে পারিলেন। এবং মনে বড়ই ব্যথা পাইয়া, এক দিন রামকে বলিলেন, দাদা! আপনি কালের নিকট স্বীকৃত কথা অনুসারে সমস্তই করুন, তাহাতে কিছুমাত্র দুঃখ বোধ করিবেন না। আপনি স্বচ্ছন্দে আমাকে পরিত্যাগ করিয়া দেবতাগণের মনের ইচ্ছা পূর্ণ করুন।

রাম লক্ষ্মণের কথায় অতিশয় দুঃখিত মনে তাঁহাকে পরিত্যাগ করিলেন এবং লক্ষ্মণ ইন্দ্রের প্রেরিত রথে উঠিয়া স্বর্গে প্রস্থান করিলেন। তার পর রামচন্দ্র কুশ ও লবকে অযোধ্যার রাজ্যে রাজা করিয়া দিয়া ভরত ও শত্রুঘ্নের সহিত মহা প্রস্থানের উদ্যোগ করিলেন। প্রজারা রামকে হারাইতে হইবে

এই দুঃখে আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া, রামের দরজায় হত্যা দিল। রাম কোন মতেই তাহাদিগকে বুঝাইতে পারেন না। অথবা বাড়ী ফিরাইতে পারিলেন না। রামের রাজত্বে তাহারা এত সুখে বাস করিত যে তাহারা আপন আপন স্ত্রী পুত্রকে পরিত্যাগ করিতে পারে কিন্তু তথাপি রামকে ছাড়িতে পারিবে না। একবার রামের বনগমনে তাহারা যথেষ্ট কষ্ট পাইয়াছে। তার পর ভাগ্যগুণে যদি পুনরায় রামকে পাইয়া-ছিল, কিন্তু এখন একেবারে জন্মের মত রামকে হারাইতে হইবে, এই ভাবনায় তাহারা একেবারে পাগলের ন্যায় হইয়া উঠিল। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিল যদি প্রাণ যায় তাহা হইলেও রামকে ছাড়িব না। কিন্তু কালের গতি ও কর্ম্মের ফলকে কে বাধা দিতে পারে। রাম প্রজাদিগের দশা দেখিয়া বড় দুঃখিত হইলেন এবং নানা প্রকারে মধুর বচনে তাহাদিগকে এই বলিয়া বুঝাইতে লাগিলেন। প্রিয়বৎস প্রজাগণ! তোমরা দেখ এই সংসার সকলেরই কাজের স্থান। এ স্থানে যে যাহার কাজ করিতেই আসিয়াছে, কয়েক দিনের জন্য মায়া মমতায় পড়িয়া স্ত্রী, পুত্র ও ভ্রাতা প্রভৃতি লইয়া জীবন কাটায়, পরে যে যাহার কাজ শেষ করিয়া, পুনরায় এ জীবন ত্যাগ করে। পৃথিবীতে কেহই চিরজীবী নহে। তোমাদের মাতাপিতা অনেক দিন মারা গিয়াছে, এবং তাহাদেরও মাতাপিতা বহুদিন হইল এইরূপ জীবন হারাইয়াছেন, আবার তোমাদের কাজ শেষ হইলে, তোমরা আর এ সংসারে থাকিবে না।

এইরূপ ভাবিয়া দেখ কেহই এখানে অধিক দিন থাকিবে না। অতি সামান্য সময়ের জন্য জীবন লইয়া তোমরা সকলেই এখানে আসিয়াছ। সেই সময় ফুরাইলেই আবার চলিয়া যাইতে হইবে। আমার কাজ শেষ হইয়াছে, এক্ষণে আমি চলিলাম।

প্রজারা রামের কথায় রোদন করিতে লাগিল এবং রামকে রাখিবার আর কোন উপায় নাই দেখিয়া, একেবারে জ্ঞানশূন্যের ন্যায় হইয়া উঠিল। অনেকদিন হইল রামের রাজত্ব শেষ হইয়াছে, ত্রেতা যুগে রাম রাজা ছিলেন, তাহার পর কত যুগ যুগান্তর চলিয়া গিয়াছে, কিন্তু অদ্যাপি লোকের মুখে রাম রাজত্বের কথা শুনা যায়।

রাম প্রজাদিগকে শান্ত করিয়া ভ্রাতৃগণের সহিত স্বর্গে গেলেন। এইখানেই রামের সহিত পৃথিবীর সম্বন্ধ একেবারে ঘুচিল।

রাম লক্ষ্মণের চরিত্র পড়িয়া বালকেরা সকলেই বুঝিতে পারিবে, যে তাঁহারা এই পৃথিবীর উদাহরণস্থল, মাতাপিতা ও গুরুজনের প্রতি কিরূপ ভক্তি করিতে হয়। তাঁহাদের সুখের জন্য ও তাঁহাদের আজ্ঞা পালনের জন্য নিজের প্রাণ পর্য্যন্ত দিয়াও তাহা পালন করিতে হয়, নিজের সত্য প্রতিজ্ঞা কিরূপে পালন করিতে হয়, ও সহোদরদিগের প্রতি কিরূপ ব্যবহার করিতে হয়, তাহা রামের চরিত্রে বিশেষরূপে দেখা যায়। কিরূপে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার আজ্ঞানুসারে চলিতে হয়, ও প্রাণ দিয়া কিরূপে তাঁহার উপকার করিতে হয়, লক্ষ্মণের চরিত্র তাহার

উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। স্বামীর প্রতি কিরূপ ভক্তি দেখাইতে হয়, দুঃখে ও বিপদে কিরূপে নিজের চরিত্র শুদ্ধ রাখিতে হয়, সীতার চরিত্রে তাহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। রামের ন্যায় গুরুভক্ত, লক্ষ্মণের ন্যায় ভ্রাতৃভক্ত, ও সীতার ন্যায় পতিব্রতা সতী পৃথিবীতে পাওয়া যায় না। বালক বালিকাগণ সর্ব্বদাই তোমরা রাম লক্ষ্মণ ও সীতার কথা মনে রাখিবে। পরীক্ষার স্থানে আসিলেই তোমরাও তাঁহাদের দৃষ্টান্ত দেখিয়া সেইরূপ হইতে চেষ্টা করিবে। যদি তোমরা কায়মনে রাম, লক্ষ্মণ ও সীতার ন্যায় হইতে চেষ্টা কর, তাহা হইলে তোমরা অবশ্যই রাম, লক্ষ্মণ ও সীতার মত হইতে পারিবে।

সম্পূর্ণ।